বাংলার নদনদী

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : সুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। ১৩৫৩ ।

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬. আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৫৭. ভারতের বনৌষধি : ডক্টর শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮. উপনিষদ্ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

॥ ১৩৫৪ ॥

৬১. ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬২. ভারতশিল্পে মূর্তি : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৩. বাংলার নদনদী : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

বাংলার নদনদী

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

আষাঢ় ১৩৫৪

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

মাতৃদেবীর স্মৃতির উদ্দেশে

সূচী


বাংলার নদনদী
স্কেল
৩০
৬০
৯০ মাইল
পার্বত্য
ত্রিপুরা
ফেনী
পার্বত্য
কর্ণফুলী
চট্টগ্রাম

বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাংলার ছোট-বড় অসংখ্য নদনদী। এই নদনদীগুলিই বাংলার প্রাণ; ইহারাই বাংলাকে গড়িয়াছে, বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে যুগে, এখনও করিতেছে। এই নদনদীগুলিই বাংলার আশীর্বাদ; এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনও কখনও বোধ হয় বাংলার অভিশাপও। এইসব নদনদী উচ্চতর ভূমি হইতে প্রচুর পলি বহন করিয়া আনিয়া বঙ্গের ব-দ্বীপের নিম্নভূমিগুলি গড়িয়াছে, এখনও সমানে গড়িতেছে। সেই হেতু ব-দ্বীপ-বঙ্গের ভূমি কোমল, নরম ও কমনীয়, এবং পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ ছাড়া বঙ্গের প্রায় সবটাই ভূতত্ত্বের দিক হইতে নবসৃষ্ট ভূমি (new alluvium)। এই কোমল, নরম ও নমনীয় ভূমি লইয়া বাংলার নদনদীগুলি ঐতিহাসিক কালে কত খেলাই না খেলিয়াছে! উদ্দাম প্রাণলীলায় কতবার যে পুরাতন খাত ছাড়িয়া নূতন খাতে, নূতন খাত ছাড়িয়া আবার নূতনতর খাতে বর্ষা ও বন্যার বিপুল জলধারাকে দুরন্ত অশ্বের মত, মত্ত ঐরাবতের মত ছুটাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সহসা খাত-পরিবর্তনে কত সুরম্য নগর, কত বাজার-বন্দর, কত বৃক্ষশ্যামল গ্রাম, শস্যশ্যামল প্রান্তর, কত মঠ ও মন্দির, মানুষের কত কীর্তি ধ্বংস করিয়াছে, আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, কত দেশখণ্ডের চেহারা ও সুখ-সমৃদ্ধি একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে তাহার হিসাবও ইতিহাস সর্বত্র রাখিতে পারে নাই। প্রকৃতির এই দুরন্ত লীলার সঙ্গে মানুষ সর্বদা আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, অনেক সময়ই হার মানিয়াছে; তাহার উপর আবার দূরদৃষ্টিহীন মানুষের দুর্বুদ্ধি সাময়িক লোভ ও লাভের হিসাব বড় করিয়া দেখিতে গিয়া জল-নিকাশের এবং প্রবাহের এই-সব স্বাভাবিক পথগুলির সঙ্গে যথেচ্ছাচারের ত্রুটি করে নাই; এখনও তাহার বিরাম নাই। তাহার ফলে এইসব নদনদী বন্যায় মহামারীতে দেশকে ক্ষণে ক্ষণে উজাড় করিয়া দিয়া, অথবা সুবিস্তৃত দেশখণ্ডকে শস্যহীন শ্মশানে

পরিণত করিয়া মানুষের উপর প্রতিশোধ লইতে ত্রুটি করে না। প্রাচীন কালে এই নদনদীগুলির প্রবাহপথের, এবং দুরন্ত প্রাণলীলার সঠিক এবং সুস্পষ্ট ইতিহাস আমাদের কাছে উপস্থিত নাই; পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক হইতে নদনদীগুলির ইতিহাস যতটা সুস্পষ্ট ধরিতে পারা যায় নানা দেশী-বিদেশী বিবরণের এবং নক্‌শার সাহায্যে, প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে নদনদীগুলির প্রবাহপথের যে চেহারা, তাহাদের যে আকৃতি-প্রকৃতি এখন আমাদের দৃষ্টি ও বুদ্ধিগোচর, প্রাচীন বাংলায় সেই চেহারা সেই আকৃতি-প্রকৃতি অনেকেরই ছিল না। অনেক পুরাতন পথ মজিয়া গিয়াছে, প্রশস্ত খরতোয়া নদী সংকীর্ণা ক্ষীণস্রোতা হইয়া পড়িয়াছে; অনেক নদী নূতন খাতে নূতনতর আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরাতন নামও হারাইয়া গিয়াছে, নদীও হারাইয়া গিয়াছে; নূতন নদীর নূতন নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব নদনদীর ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস। ইহাদেরই তীরে তীরে মনুষ্যসৃষ্ট সভ্যতার জয়যাত্রা; মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম-কর্ম সব কিছুর বিকাশ ইহাদের আশ্রয় করিয়াই। বাংলার শস্যসম্পদ একান্তই এই নদীগুলির দান। উচ্ছলিত উচ্ছ্বসিত উদ্দাম বন্যায় মানুষের ঘরবাড়ি ভাঙিয়া যায়, মানুষ গৃহহীন পশুহীন হয়; আবার এই বন্যাই তাহার মাঠে মাঠে সোনা ফলায় পলি ছড়াইয়া; এই পলিই সোনার সারমাটি। বাঙালী তাই এই নদীগুলিকে ভয়ভক্তি যেমন করিয়াছে, ভালও তেমনই বাসিয়াছে; রাক্ষসী কীর্তিনাশা বলিয়া গাল যেমন দিয়াছে, তেমনই ভালবাসিয়া নাম দিয়াছে ইচ্ছামতী, ময়ূরাক্ষী, কবতাক্ষ (কপোতাক্ষ), চূর্ণী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, মধুমতী, কৌশিকী, দামোদর, অজয়, করতোয়া, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, মেঘনা (মেঘনাদ বা মেঘানন্দ), সুরমা, লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র)। বস্তুত, বাংলার, শুধু বাংলারই বা কেন, ভারতবর্ষের নদনদীগুলির নাম কি সুন্দর অর্থ ও ব্যঞ্জনাময়!

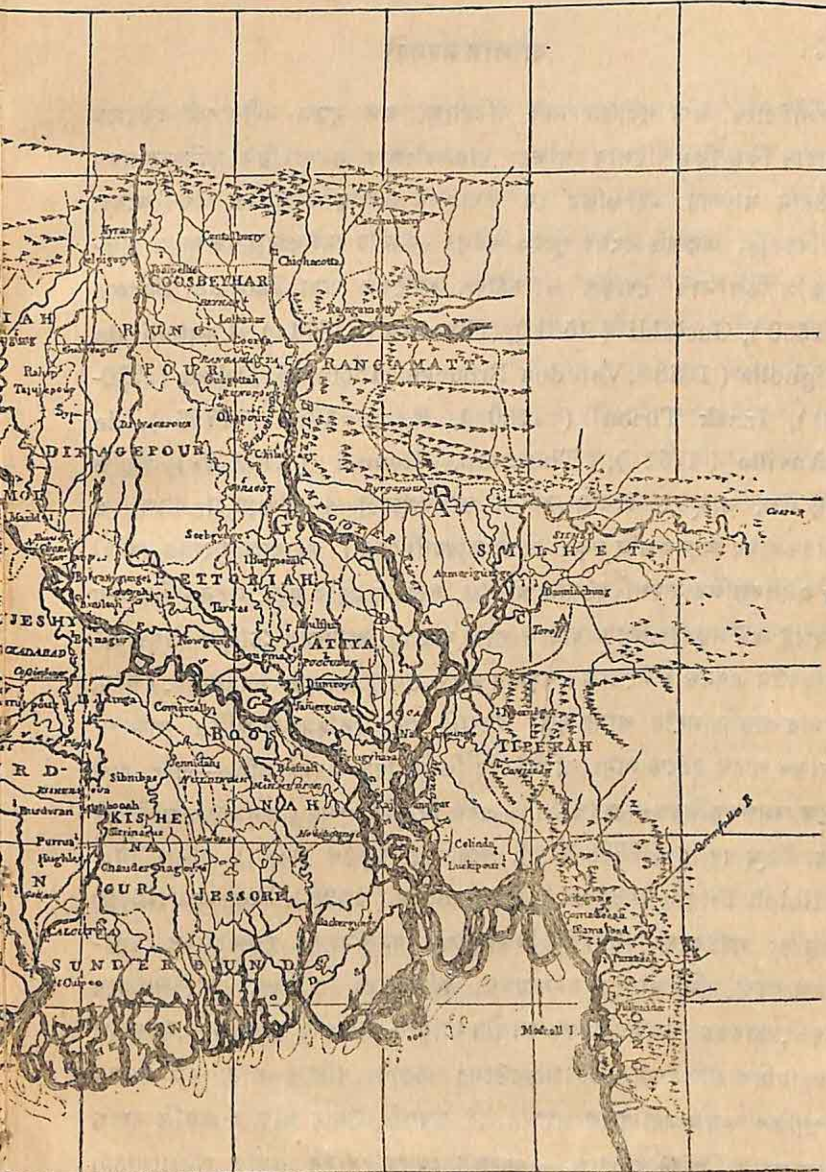
বাংলার এই নদনদীগুলি সমগ্র পূর্ব-ভারতের দায় ও দায়িত্ব বহন করে। উত্তর-ভারতের প্রধানতম দুইটি নদীর—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের—বিপুল নদীজলধারা ও পলিপ্রবাহ, এবং পূর্ব-যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামের বৃষ্টিপাতপ্রবাহ বহন করিয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবার দায়িত্ব বহন করিতে হয় বাংলার কমনীয় মাটিকে। সেই মাটি সর্বত্র এই সুবিপুল জলপ্রবাহ বহন করিবার উপযুক্ত নয়। এই জলপ্রবাহ নূতন ভূমি যেমন গড়ে, মাঠে শস্য যেমন ফলায়, তেমনই ভূমি ভাঙেও, শস্য বিনাশও করে। বাঙালী ক্রোধভরে পদ্মাকে বলিয়াছে কীর্তিনাশা; পদ্মা বাঙালীর অনেক কীর্তিই নষ্ট করিয়াছে সত্য—করিবে না-ই বা কেন? গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সুবিপুল জলধারা নিম্নতম প্রবাহে সে একা বহন করে, তাহাতে আসিয়া নামে প্রচুর বৃষ্টিপ্রবাহ, নিম্নভূমির সাগরপ্রমাণ বিল-হাওরের অগাধ জলরাশি। দুর্দম মত্ততার অধিকার তাহার না থাকিলে থাকিবে কাহার? এবং, সেই মত্ততা নরম নমনীয় নূতন মাটির উপর। ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে ও হইতেছে। অথচ, এই পদ্মা-মেঘনাই তো আবার স্বর্ণশস্যের আকর; এই পদ্মা-মেঘনার দুই তীরেই তো ঘনতম মনুষ্য বসতি, সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যের লীলা। মানুষ যদি পদ্মা-মেঘনাকে বশে আনিতে না পারিয়া থাকে, সে যদি আপন দুর্বুদ্ধিবশে ইহাদের মত্ততাকে আরও নির্মম আরও দুরন্ত করিয়া থাকে, তবে সেই দোষ পদ্মা-মেঘনার নয়। কিন্তু, ইতিহাস আলোচনায় এসব জল্পনা হয়ত অবান্তর।

উপাদান

বাংলার ভূ-প্রকৃতিতে নদীর খাত যুগে যুগে পরিবর্তিত হওয়া, পুরাতন নদী মজিয়া মরিয়া যাওয়া, নূতন নদীর সৃষ্টি হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতকের শেষ—এই চারি শতাব্দীর মধ্যে বাংলার প্রধান অপ্রধান ছোট বড় কত নদনদী যে কতবার খাত


NAPAL
Harriapour
ORACPOUR
MUCWANNY
BETTIAH
SARANG
GAZYPOUR
Mahmudabad
Chuprah
SHAWABAD
ROTAS
Daoudnagur
Rotas Gur
MONGHIR
TYROOT
PURAN
RAMGUR
KOONDA
PALAMOW
SIRGOOJAH
BURWA
INGROWLA
Chuta
Nag
pore
Pat
coom
Burra
boom
Sing
boom
Midnapoor
SUMBUL
POOR
MOHUR
BUNGE
Balafore Road
CUTTACK

রেণেলের নকশা



COOSBEYHAR
Chichacotta
Rangamatty
RANGAMATT
DINAGEPOUR
PETTORIAH
ATTYA
Byrgapour
SILHET
Azmeriegunge
Bunniachung
TIPERAH
Noacolly
Luckipour
Celinda
Chitagong
Islamabad
Mascall I.
JESSORE
Backergunge
Jennidaky
Commercally
Burdwan
Hughley
Chandernagore
Calcutta
SUNDERBUNDS
Culpee

া (১৭৬৪-৭৬ খ্রী)

বদলাইয়াছে, কত পুরাতন নদী মরিয়াছে, কত নূতন নদীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কিছু কিছু হিসাব পাওয়া যায় বাংলার সমসাময়িক ভূমি-নক্শায়। বর্তমান বাংলায় নদীগুলির যে প্রবাহপথ ও আকৃতি-প্রকৃতি এখন আমরা দেখিতেছি, একশত বৎসর পূর্বেও এইসব নদনদীর সেই প্রবাহপথ বা আকৃতি-প্রকৃতি ছিল না। ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যে Jao de Barros (1550), Gastaldi (1561), Hondivs (1614), Cantelli da Vignolla (1683), Van den Broucke (1660), G. Delisle (1720-40), Izzak Tirion (1730), F. de Witt (1726), de l'Auville (1752), Thornton, Rennel (1764-76) প্রভৃতি পর্তুগীজ, ডাচ্ ও ইংরাজ বণিক, রাজকর্মচারী ও পণ্ডিতেরা বাংলা ও ভারতবর্ষের অনেকগুলি নক্শা রচনা করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে বাংলার নদনদী ও জনপদগুলির ক্রমপরিবর্তমান আকৃতি, পুরাতন নদীর মৃত্যু, নূতন নদীর জন্ম সমস্তই এই নক্শাগুলিতে ধরিতে পারা যায়। আমাদের চোখের উপর এই পরিবর্তন এখনও চলিতেছে। যমুনার খাতে ব্রহ্মপুত্রের নূতনতর প্রবাহ, ভৈরব, কুমার প্রভৃতি নদীর আসন্ন মৃত্যু ইত্যাদি তো সেদিনকার স্মৃতি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক হইতে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া নদনদীগুলির—এবং সঙ্গে সঙ্গে জনপদগুলিরও—ক্রমপরিণতি এখন অনেকটা স্পষ্ট। শুধু নক্শাগুলিতেই নয়, ইব্‌ন্ বতুতা (1328-54), বারণি (চতুর্দশ শতক), রালফ ফিচ (Ralph Fitch, 1583-91), Fernandes (1598), Fonseca (1599) প্রভৃতি পর্যটকদের বিবরণী, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, গোবিন্দদাসের কড়চা, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল জাতীয় সাহিত্য-গ্রন্থ এবং মুসলমান লেখকদের সমসাময়িক ইতিহাসেও এই পরিবর্তনের চেহারা ধরিতে পারা কঠিন নয়। সাম্প্রতিক কালে নদীমাতৃক বাংলার এই ক্রমপরিবর্তমান আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনাও যথেষ্ট হইয়াছে। কাজেই এখানে সে-সব কথার পুনরালোচনা

করিয়া লাভ নাই। ষোড়শ শতকের পরেই শুধু নয়, আগেও বাংলার প্রধান প্রধান নদনদীগুলি যুগে যুগে এই ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছে, এমন অনুমান কিছুতেই অসংগত নয়; তাহার কিছু কিছু প্রমাণও আছে। কারণ, প্রাচীন সাহিত্যে, টলেমির নক্শায় ও প্রাচীন লিপিমালায় বাংলার দুই চারিটি নদনদীর প্রবাহপথ সম্বন্ধে যে-ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা বর্তমান প্রবাহপথ তো নয়ই, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রবাহপথের সঙ্গেও তাহার মিল নাই। অষ্টাদশ শতকে রেনেলের, সপ্তদশ শতকে ফান্ ডেন্ ব্রোকের, এবং ষোড়শ শতকে জাও ডি বারোসের নক্শায় নদনদীগুলির গতিপথ অনেকটা পরিষ্কার দেখানো হইয়াছে; এই তিন নক্শার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া পশ্চাৎক্রম অনুসরণ করিলে হয়তো মধ্যযুগপূর্ব বাংলার নদনদীর চেহারা ধরিতে পারা খানিকটা সহজ হইবে। টলেমির নক্শা (দ্বিতীয় শতক) নানা দোষে দুষ্ট, ঐতিহাসিকদের কাছে তাহা অজ্ঞাত নয়। সুতরাং সে নক্শার উপর খুব বেশি নির্ভর করা চলে না; তবু কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া একেবারে অসম্ভব না-ও হইতে পারে।

গঙ্গা-ভাগীরথী

গঙ্গা-ভাগীরথী লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। রাজমহলের সোজা উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার তীর প্রায় ঘেঁষিয়া তেলিগড় ও সিক্রিগলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম—বাংলার প্রবেশপথ। এই পথের মুখের নিকটেই কেন লক্ষ্মণাবতী-গৌড়, পাণ্ডুয়া, টাণ্ডা, রাজমহল মধ্যযুগে বহুদিন একের পর এক বাংলার রাজধানী ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নয়; সামরিক ও রাষ্ট্রীয় কারণেই তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই গিরিবর্ত্ম দুইটি ছাড়িয়া রাজমহলকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গা বাংলার সমতল ভূমিতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ফান্ ডেন্ ব্রোকের (১৬৬০) নক্শায় দেখিতেছি, রাজমহলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া, মুর্শিদাবাদ-কাসিমবাজারের মধ্যে গঙ্গার তিনটি দক্ষিণ-বাহিনী

শাখার জল কাসিমবাজারের একটু উত্তর হইতে একত্র বাহিত হইয়া সোজা দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছে সমুদ্রে, বর্তমান গঙ্গা-সাগরসংগম তীর্থে। কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী পর রেনেলের নক্শায় দেখিতেছি, রাজমহলের দক্ষিণ-পূর্বে তিনটি বিভিন্ন শাখা একটি মাত্র শাখায় রূপান্তরিত, এবং তাহাই (সুতি হইতে গঙ্গাসাগর) দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা। যাহাই হউক, রেনেল কিন্তু এই দক্ষিণ-বাহিনী নদীটিকে গঙ্গা বলিতেছেন না; তিনি গঙ্গা বলিতেছেন আর-একটি প্রবাহকে, যে-প্রবাহটি অধিকতর প্রশস্ত, জীবন্ত এবং দুর্দম, যেটি পূর্ব-দক্ষিণ বাহিনী হইয়া বর্তমান বাংলার হৃদয়-দেশের উপর দিয়া তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে অবতরণ করিয়াছে, আমরা যাহাকে বলি পদ্মা। ফান্ ডেন ব্রোক্ এবং রেনেল দুজনের নক্শাতেই দেখিতেছি গঙ্গার সুবিপুল জলধারা বহন করিতেছে পদ্মা; দক্ষিণ-বাহিনী নদীটি ক্ষীণতরা।

ছোটগঙ্গা : বড়গঙ্গা

ফান্ ডেন্ ব্রোক্ বা রেনেল যে-নামেই এই দুইটি নদীকে অভিহিত করুন না কেন, দেশের ঐতিহ্যে এই নদীদুইটির নাম কি ছিল দেখা যাইতে পারে। ফান্ ডেন্ ব্রোকের আড়াই শত বৎসর আগে কবি কৃত্তিবাসের কাল (১৩২০ শক=১৪১৫-১৬ খ্রী)। কৃত্তিবাসের পিতৃভূমি ছিল বঙ্গে (পূর্ব-বাংলায়?); তাঁহার পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা বঙ্গ(ভাগ) ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন, যে-ফুলিয়ার "দক্ষিণে-পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী"। নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত দক্ষিণ-বাহিনী নদীটির, আমরা যাহাকে বলি ভাগীরথী (বর্তমান হুগলী নদী), তাহার কথাই কৃত্তিবাস বলিতেছেন। কিন্তু, এই গঙ্গা ছোটগঙ্গা। কারণ, এগার পার হইয়া কৃত্তিবাস যখন বার বৎসরে প্রবেশ করিলেন তখন "পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়-গঙ্গা পার" এবং সেখানে নানা বিদ্যা অর্জন করিয়া তদানীন্তন

গৌড়েশ্বর রাজা কংস বা গণেশের সভায় রামায়ণ রচনা করিলেন। নিশ্চিত যে, এই বড়গঙ্গাই পদ্মা। এই কথার আরও সমর্থন পাওয়া যায় কৃত্তিবাস-রামায়ণের অন্যতম একটি পুঁথিতে। কৃত্তিবাস নিজ বাল্যজীবনের কথা বলিতেছেন,

পিতা বনমালী মাতা মাণিক [মেনকা] উদরে।
জনম লভিল ওঝা ছয় সহোদরে॥
ছোটগঙ্গা বড়গঙ্গা বড় বলিন্দা [নিঃসন্দেহে, বরেন্দ্র-বরেন্দ্রী] পার।
যথা তথা কর‍্যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার॥
রাঢ়ামধৈ [রাঢ়-মধ্যে ?] বন্দিনু আচার্য চূড়ামণি।
যার ঠাঁই কৃত্তিবাস পড়িলা আপনি॥

স্পষ্টতই গঙ্গার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী দুই প্রবাহকেই কৃত্তিবাস যথাক্রমে ছোটগঙ্গা ও বড়গঙ্গা বলিতেছেন। তিনি তদানীন্তন ভাগীরথী-পথের সুন্দর বিবরণও দিতেছেন। সে-কথা পরে উল্লেখ করিতেছি। আপাতত এইটুকু পাওয়া গেল যে, পঞ্চদশ শতকের গোড়াতেই পদ্মা বৃহত্তরা নদী, উহাই বড়গঙ্গা। কিন্তু যত প্রশস্ততরা, যত দুর্দম দুর্দান্তই হোক না কেন, ঐতিহ্য-মহিমায় কিংবা লোকের শ্রদ্ধাভক্তিতে বড়গঙ্গা ছোটগঙ্গার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। হিন্দুর স্মৃতি-ঐতিহ্যে গঙ্গার জলই পাপ মোচন করে, পদ্মার নয়; পদ্মা কীর্তিনাশা; পদ্মা ভীষণা ভয়ংকরী উন্মত্তা।

গঙ্গা-ভাগীরথীই যে প্রাচীনতরা এবং পুণ্যতোয়া নদী, ইহাই যে হিন্দুর পরম তীর্থ জাহ্নবী এ সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং লিপিমালা একমত। পদ্মাকে গঙ্গা কখনো কখনো বলা হইয়াছে, কিন্তু ভাগীরথী-জাহ্নবী একবারও বলা হয় নাই। বাংলাদেশের গ্রন্থ ও লিপিই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। ধোয়ীর পবনদূতে ত্রিবেণী-সংগমের ভাগীরথীকেই বলা হইয়াছে গঙ্গা; লক্ষণসেনের গোবিন্দপুর পট্টোলীতে বর্ধমানভুক্তির বেতড্ড চতুরকের (হাওড়া জেলার বেতড়) পূর্ব-বাহিনী নদীটির নাম জাহ্নবী; বল্লালসেনের নৈহাটি

লিপিতে গঙ্গা-ভাগীরথীকেই বলা হইয়াছে "সুরসরিৎ" [স্বর্গনদী বা দেবনদী], রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে উত্তর-রাঢ় পূর্বসীমায় গঙ্গাতীরশায়ী—যে-গঙ্গার সুগন্ধ পুষ্পবাহী জল অসংখ্য তীর্থঘাটে ঢেউ দিয়া দিয়া প্রবাহিত হইত (the Ganga whose waters bearing fragrant flowers dashed against the bathing places)। এইসব 'bathing places' তীর্থঘাট ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং পুষ্প স্নান-পূজার ফুল, সন্দেহ কি! এই পূজা ভাগীরথীর ভাগ্যেই জোটে, পদ্মার নয়!

পদ্মা বা বড়গঙ্গার কথা পরে বলার সুযোগ হইবে ; ভাগীরথী বা ছোট-গঙ্গার কাহিনী আগে শেষ করিয়া লই। যাহাই হউক, পঞ্চদশ শতকে ভাগীরথী সংকীর্ণতোয়া সন্দেহ নাই, কিন্তু তখন তাহার প্রবাহ আজিকার মত ক্ষীণ নয়। সাগরমুখ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে চম্পা-ভাগলপুর পর্যন্ত সমানে বড় বড় বাণিজ্যতরীর চলাচল তখনও অব্যাহত। ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায় এই পথের দুই ধারের নগর-বন্দরের এবং পূর্ব ও পশ্চিমাগত শাখা-প্রশাখা নদীগুলির সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। নক্শা খুলিলেই তাহাদের পরিচয় পাওয়া যাইবে, এবং ভাগীরথীই যে সংকীর্ণতর হওয়া সত্ত্বেও প্রধানতর প্রবাহ তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সাম্প্রতিক কালে বহু প্রমাণ-প্রয়োগের সাহায্যে এই প্রবাহের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। ফান্ ডেন্ ব্রোকের কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর আগে বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁহার মনসামঙ্গলে এই প্রবাহপথের যে বিবরণ দিতেছেন তাহা সুপরিচিত নয়। কাজেই, এখানে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিপ্রদাসের চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যতরী রাজঘাট, রামেশ্বর পার হইয়া সাগরমুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে ; পথে পড়িতেছে, অজয় নদী, উজানী, শিবা নদী (বর্তমান শিয়ালনালা), কাটোয়া, ইন্দ্রাণী নদী, ইন্দ্রঘাট, নদীয়া, ফুলিয়া, গুপ্তিপাড়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, (সপ্তগ্রাম যে গঙ্গা-সরস্বতী-যমুনাসংগমে, বিপ্রদাস তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই), কুমারহাট, ডাইনে হুগুলী, বামে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরো, পূর্বে কাকিনাড়া,

তারপর মূলাজোড়া, গাড়ুলিয়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ডাইনে চাঁপদানি, বামে ইচ্ছাপুর, বাঁকিবাজার, নিমাইতীর্থ (বর্তমান বৈদ্যবাটি), চানক, মাহেশ, খড়দহ, শ্রীপাট, ডাইনে রিসিড়া (রিষড়া), বামে সুকচর, পশ্চিমে কোন্নগর, ডাইনে কোতরং, বামে কামারহাটি, পূর্বে আড়িয়াদহ (এড়েদহ), পশ্চিমে ঘুষুড়ি, তারপর পূর্বকূলে চিত্রপুর (চিৎপুর), কলিকাতা, (পশ্চিমকূলে) বেতড় (একাদশ শতক লিপির বেতড্ড চতুরক), তারপর কালীঘাট, চূড়াঘাট,, বারুইপুর, ছত্রভোগ, বদরিকাকুণ্ড, হাথিয়াগড়, চৌমুখী, শতমুখী, এবং সর্বশেষে সাগরসংগমতীর্থ যেখানে "তীর্থকার্য শ্রাদ্ধ কৈল পবিত্র তর্পণ॥ তাহার মেলান ডিঙ্গা সংগমে প্রবেশে। তীর্থকার্য কৈল রাজা পর[ম] হরিষে॥" সাগর-সংগমের নিকট গঙ্গা তো সত্যই চারিমুখে শতমুখে কেন, অসংখ্য খাল-নালায় শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যুধিষ্ঠির পঞ্চশতমুখী গঙ্গার সাগরসংগমে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিপ্রদাসের উপরোক্ত বর্ণনার সঙ্গে ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শার বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই এক। নদীয়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী (Tripeni), সপ্তগ্রাম (Coatgam), হুগলী (Oegli ; পর্তুগীজ বণিকদের Ogulium), কলিকাতা (ফান্ ডেন্ ব্রোক Collecate এবং Calcutta নামে সংলগ্ন প্রায় দুইটি বন্দরের নাম করিতেছেন—একটি বিপ্রদাসের কলিকাতা এবং অপরটি কালীঘাট বলিয়া মনে হয়) প্রভৃতি নাম পাওয়া যাইতেছে। লক্ষ্যণীয় এই, পঞ্চদশ শতকেই বিপ্রদাস হুগলী ও কলিকাতার উল্লেখ করিতেছেন, এবং ইহাই হুগলী ও কলিকাতার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ। তবে, সন্দেহ হয়, বিপ্রদাসের মূল তালিকায় পরবর্তী কালের গায়েনরা হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি নাম সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন ; মূল তালিকায় এ-দুটি নাম ছিল না। পঞ্চদশ শতকে কলিকাতার উল্লেখ সত্যই যথেষ্ট সন্দেহজনক ! ১৪৯৫-র (বিপ্রদাসের) পরে এবং ১৬৬০-র (ফান্ ডেন্ ব্রোকের) আগে বরা(হ)নগর, চন্দননগর, প্রভৃতি বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে ; শুধু যে ফান্ ডেন্ ব্রোকই ইহাদের উল্লেখ

করিয়াছেন তাহা নয়, জাও ডি বারোসের নক্‌শায়ও অগ্রপাড়া (Agrapara) বরাহনগরের (Bernagar) উল্লেখ পাইতেছি, সপ্তগ্রামের (সাতগাঁও = Satigam) সঙ্গে। ইতিহাসের তথ্যও তাহাই। হুগলীও ব্রোকের সময় ফাঁপিয়া উঠিয়াছে।

আদিগঙ্গা

যাহাই হউক, বিপ্রদাস ও ফান্ ডেন্ ব্রোকের নিকট হইতে কয়েকটি প্রধান প্রধান তথ্য পাওয়া গেল। প্রথমত, ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহই, অন্তত কলিকাতা পর্যন্ত, পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতকের প্রধানতম প্রবাহ। দ্বিতীয়ত, ত্রিবেণী বা মুক্তবেণীতে সরস্বতী-ভাগীরথী-যমুনা সংগম। তৃতীয়ত, কলিকাতা ও বেতড়ের দক্ষিণে বর্তমানে আমরা যাহাকে বলি আদিগঙ্গা—সেই আদিগঙ্গার খাতেই ভাগীরথীর সমুদ্রযাত্রা ; অন্তত বিপ্রদাসের চাঁদ সওদাগর সেই পথেই যে গিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। সপ্তদশ শতকে ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্‌শায় দেখা যায় তখনও আদিগঙ্গার খাত খুব প্রশস্ত, কিন্তু সেই খাতে কোনও গ্রাম-নগর-বন্দরের উল্লেখ নাই। হইতে পারে, এই খাতে বৃহৎ নৌকা-চলাচল বিশেষ আর হইতেছে না। এই অনুমানের কারণ, এক শত বৎসর পরে রেনেলের নক্‌শায় দেখিতেছি, আদিগঙ্গার কোনও চিহ্নই নাই, অর্থাৎ এই এক শতকের মধ্যে আদিগঙ্গা তাহার বর্তমান আকৃতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহাই ইতিহাসসম্মত ; কারণ, শোনা যায়, নবাব আলীবর্দীর আমলে কলিকাতা-বেতড়ের দক্ষিণে বর্তমান ভাগীরথী প্রবাহের প্রবর্তন হইয়াছিল। আদিগঙ্গা পলি পড়িয়া চলাচলের অযোগ্য হইলে আলীবর্দী নাকি বর্তমান সোজা দক্ষিণবাহী প্রবাহটির মুখ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু, আলীবর্দী নূতন প্রবাহপথ কাটিয়া বাহির করেন নাই ; এ-পথ আদিগঙ্গা অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক অপেক্ষাও পুরাতন, এবং বোধ হয় সরস্বতীর প্রাচীনতর খাতের দক্ষিণতম অংশ।

পঞ্চদশ শতকের (বিপ্রদাসের) আগে ভাগীরথী অন্তত আংশিকত এই সরস্বতীর খাত দিয়াই সমুদ্রে প্রবাহিত হইত, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। আনুমানিক ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার দক্ষিণে উলুবেড়িয়া-গঙ্গাসাগরখাতে ভাগীরথী প্রবাহিত হইত, এমন লিপি-প্রমাণ বিদ্যমান। পুরাণে, বিশেষত মৎস্য- ও বায়ু-পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, তাম্রলিপ্ত দেশের ভিতর দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। সম্ভবত সমুদ্র-সন্নিকট গঙ্গার তীরেই ছিল তাম্রলিপ্তের সুবৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। এ-সম্বন্ধে মৎস্য-পুরাণের উক্তিকে পৌরাণিক উক্তির প্রতিনিধি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। হিমালয়-উৎসারিত পূর্ব-দক্ষিণবাহী সাতটি প্রবাহকে এই পুরাণে গঙ্গা বলা হইয়াছে ; এই সাতটির মধ্যবর্তী প্রবাহটির ভাগীরথী নামকরণ-প্রসঙ্গে ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা-আনয়নের সুবিদিত গল্পটিও এইখানে বিবৃত করা হইয়াছে। এই পুরাণে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, কুরু, ভরত, পঞ্চাল, কৌশিক ও মগধ দেশ পার হইয়া বিন্ধ্যশৈলশ্রেণী-গাত্রে (রাজমহল-সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম শৈলমূলে) প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মোত্তর (উত্তর-রাঢ়), বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত (সুহ্ম) দেশের ভিতর দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত। প্রাচীন বাংলায় ভাগীরথীর প্রবাহপথের ইহার চেয়ে সংক্ষিপ্ত সুন্দর সুস্পষ্ট বিবরণ আর কি হইতে পারে? একটু পরেই আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, উত্তর ও দক্ষিণ-বিহারের ভিতর দিয়া রাজমহলের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়া রাজমহল-সাঁওতালভূমি-ছোট-নাগপুর-মানভূম-ধলভূমের শৈলভূমিরেখা ধরিয়া যে অগভীর ঝিল ও নিম্ন-জলাভূমি সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সেই ভূমিরেখাই ভাগীরথীর সন্ধান-সম্ভাব্য-প্রাচীনতম খাত। যাহাই হউক, পুরাণ-বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এক্ষেত্রে ভাগীরথী-প্রবাহের কথাই ইঙ্গিত করা হইতেছে, এবং ইহাকেই বলা হইতেছে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ। এই প্রবাহ উত্তর-রাঢ়দেশের ভিতর দিয়া

দক্ষিণবাহী, এবং তাহার পূর্বে বঙ্গ, পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত, এই ইঙ্গিতও যেন মৎস্য-পুরাণে পাওয়া যাইতেছে। ইহাই তো ইতিহাস-সম্মত। ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা-আনয়নের গল্প রামায়ণেও আছে, এবং সেখানেও গঙ্গা বলিতে রাজমহল-গঙ্গাসাগর প্রবাহকেই যেন বুঝাইতেছে। যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগর-সংগমে তীর্থস্নান করিতে আসিয়াছিলেন, এবং সেখান হইতে গিয়াছিলেন কলিঙ্গদেশে। রাজমহল-গঙ্গাসাগর প্রবাহই যে যথার্থত ভাগীরথী ইহাই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের ইঙ্গিত, এবং এই প্রবাহের সঙ্গেই সুদূর অতীতের সূর্যবংশীয় ভগীরথ রাজার স্মৃতি বিজড়িত। উইলিয়ম উইলককস্ সাহেব এই ভগীরথ-ভাগীরথী কাহিনীর যে পৌর্তিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা ইতিহাস-সম্মত বলিয়া মনে হয় না।

পদ্মা-প্রবাহ অপেক্ষা ভাগীরথী-প্রবাহ যে অনেক প্রাচীন এ-সম্বন্ধেও কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। যাহা হউক, জাও ডি বারোসের (১৫৫০) এবং ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায় (১৬৬০) পুরাণোক্ত প্রাচীন প্রবাহপথের ইঙ্গিত বর্তমান বলিয়া মনে হয়। এই দুই নক্শার তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সপ্তদশ শতকে জাহানাবাদের নিকটে আসিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দামোদরের একটি প্রবাহ (ক্ষমানন্দ-কথিত বাঁকা দামোদর) উত্তর-পূর্ব বাহিনী হইয়া নদীয়া-নিমতার দক্ষিণে গঙ্গায়, এবং আর-একটি প্রবাহ দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া নারায়ণগড়ের নিকটে রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার সঙ্গে মিলিত হইয়া তম্বোলি বা তমলুকের পাশ দিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। আর, মধ্য ভূখণ্ডে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের নিকট হইতে তৃতীয় আর-একটি প্রবাহ (অর্থাৎ সরস্বতী) ভাগীরথী হইতে বিযুক্ত হইয়া পশ্চিম দিকে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া কলিকাতা-বেতড়ের দক্ষিণে পুনর্বার ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। এক শতাব্দী আগে, ষোড়শ শতকে জাও ডি বারোসের নক্শায় দেখিতেছি সরস্বতীর প্রবাহপথ একবারে ভিন্নতর। সপ্তগ্রামের (Satigam) নিকটেই সরস্বতীর উৎপত্তি, কিন্তু সপ্তগ্রাম হইতে

সরস্বতী সোজা পশ্চিম-বাহিনী হইয়া যুক্ত হইতেছে দামোদর-প্রবাহের সঙ্গে, বাঁকা দামোদর সংগমের নিকটেই। এই বাঁকা দামোদরের কথা বলিয়াছেন সপ্তদশ শতকের (১৬৪০) কবি ক্ষমানন্দ তাঁহার মনসামঙ্গল কাব্যে, সে-কথা পরে উল্লেখ করিতেছি। যাহাই হউক, বর্ধমানের দক্ষিণে দামোদর যেখান হইতে দক্ষিণবাহী হইয়াছে সেইখানে সরস্বতীর সঙ্গে তাহার সংযোগ—ইহাই জাও ডি বারোসের নক্‌শার ইঙ্গিত। আমার অনুমান, এই প্রবাহপথই গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীনতর প্রবাহপথ, এবং সরস্বতীর পথ ইহার নিম্ন অংশ মাত্র। তাম্রলিপ্ত হইতে এই পথে উজান বাহিয়াই বাণিজ্য-পোতগুলি পাটলিপুত্র-বারাণসী পর্যন্ত যাতায়াত করিত; এবং এই নদীতেই পশ্চিম দিকে ছোটনাগপুর-মানভূমের পাহাড় হইতে উৎসারিত হইয়া স্ব-স্বতন্ত্র অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদ তাহাদের জলস্রোত ঢালিয়া দিত। ইহাই প্রাচীন বাংলার গঙ্গা-ভাগীরথীর নিম্নতর প্রবাহ। এখনও ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, শিলাই, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতি নদনদী ভাগীরথীতে জলধারা মেশায় সত্য, কিন্তু ইহাদের ভাগীরথীসংগমস্থান ভাগীরথীপ্রবাহ-পথের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পূর্বদিকে সরিয়া আসিয়াছে; এবং ইহাদের, বিশেষ-ভাবে দামোদর এবং রূপনারায়ণের, প্রবাহপথও নিম্নপ্রবাহে ক্রমশ অধিকতর দক্ষিণবাহা হইয়াছে। বর্ধমানের দক্ষিণে দামোদরের প্রবাহপথের পরিবর্তন খুব বেশি হইয়াছে। ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্‌শায় (১৬৬০) দেখা যায় বর্ধমানের দক্ষিণ-পথে দামোদরের একটি শাখা সোজা উত্তর-পূর্ববাহী হইয়া আম্বোনা (Ambona)-কালনার কাছে ভাগীরথীতে পড়িতেছে। ক্ষমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ দাসের (কেতকদাস) মনসামঙ্গলে (১৬৪০ আনুমানিক) এই শাখাটিকেই বুঝি বলা হইয়াছে "বাঁকা দামোদর"। এই বাঁকা নদীর তীরে তীরে যে-সব স্থানের নাম কেতকদাস-ক্ষমানন্দ করিয়াছেন তাহার তালিকা: কুঝাটি বা ওঝটি, গোবিন্দপুর, গাংপুর, দে-পুর, নেয়াদা বা নর্মদাঘাট, কেজুয়, আদমপুর, গোদাঘাট, কুকুরঘাটা, হাসনহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর ও

গহরপুর ; গহরপুরের পরেই বাঁকা দামোদর "গঙ্গার জলে মিলি"য়া গেল। দামোদরের দক্ষিণবাহী প্রবাহপথেই যে এক সময় সরস্বতীর প্রবাহপথ ছিল, আমার এ-অনুমান আগেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। জাও ডি বারোসের নক্শার ইঙ্গিত তাহাই। পরে সরস্বতী এই পথ পরিত্যাগ করিয়া সোজা দক্ষিণবাহিনী হইয়া রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার প্রবাহপথে কিছুদিন প্রবাহিত হইত। বস্তুত, রূপনারায়ণের নিম্নপ্রবাহ একদা সরস্বতীরই প্রবাহপথ ছিল বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক, অষ্টম শতকের পরেই সরস্বতী-ভাগীরথীর এই প্রাচীনতর প্রবাহ-পথের মুখ এবং নিম্নতম প্রবাহ শুকাইয়া যায়, এবং তাহারই ফলে তাম্রলিপ্ত বন্দর পরিত্যক্ত হয়। অষ্টম হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে কোনও সময় সরস্বতী তাহার প্রাচীনতর পথ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমানের খাত প্রবর্তন করিয়া থাকিবে এবং সেই খাতেও কিছুদিন ভাগীরথীর প্রবলতর স্রোত চলাচল করিয়া থাকিবে। চতুর্দশ শতকের গোড়াতেই সপ্তগ্রামে মুসলমানদের অন্যতম রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এ তথ্য সুবিদিত। কিন্তু দশম শতক হইতে নিম্নপ্রবাহে কলিকাতা-বেতড় পর্যন্ত ভাগীরথীর বর্তমান পথই প্রধানতম পথ এবং আরও দক্ষিণে আদি-গঙ্গার পথ। আলীবর্দীর সময়ে আদিগঙ্গা পরিত্যক্ত হইয়া মধ্যযুগের সরস্বতীর পরিত্যক্ত পথেই গঙ্গা-ভাগীরথীর পথ প্রবর্তিত হয়। বিপ্রদাসের চাঁদ সদাগর ত্রিবেণীর পরেই সরস্বতীতীরে সপ্তগ্রামের সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন। ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধিশালী বন্দর-নগর—তাঁহার বর্ণনাই তাহা প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া চাঁদ সদাগর সরস্বতীর পথে আর অগ্রসর হইতেছেন না, তিনি বর্তমান ভাগীরথীর প্রবাহে ফিরিয়া আসিতেছেন ; কারণ, সপ্তগ্রামের পরেই উল্লেখ পাইতেছি কুমারহাট এবং হুগলীর। মনে হয় ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দেই সরস্বতীর পথে বেশিদূর আর অগ্রসর হওয়া যাইতেছে না, এবং সেই পথে বৃহৎ বাণিজ্যতরী চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে দেখিতেছি ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায় Oegli বা হুগলী খুব ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, তখনও Tripeni (ত্রিবেণী), Coatgam

(সাতগাঁ) বিদ্যমান, কিন্তু উভয়েই মুমূর্ষু। ইহাই ইতিহাস-সম্মত। কারণ, আগরপাড়া (Agrapara) বরাহনগর (Beranagar) ইত্যাদির উল্লেখ বারোসের নক্‌শাতে দেখিতেছি (১৫৫০) ; তাঁহার নক্‌শায় কিন্তু হুগুলীর উল্লেখ নাই। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেড্‌রিক সাহেব স্পষ্ট বলিতেছেন, বাতোর (Bator) বা বেতড়ের উত্তরে সরস্বতীর প্রবাহ অত্যন্ত অগভীর হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য ছোট ছোট জাহাজ যাওয়া আসা করিতে পারে না। নিশ্চয়ই এই কারণে পর্তুগীজেরা ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রামের পরিবর্তে হুগলীতেই তাহাদের বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহার পর ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফান্ ডেন্ ব্রোক্ Oegli খুব মোটা মোটা অক্ষরে উল্লেখ করিবেন তাহা মোটেই আশ্চর্য নয়।

যমুনা-গঙ্গার উত্তর প্রবাহ

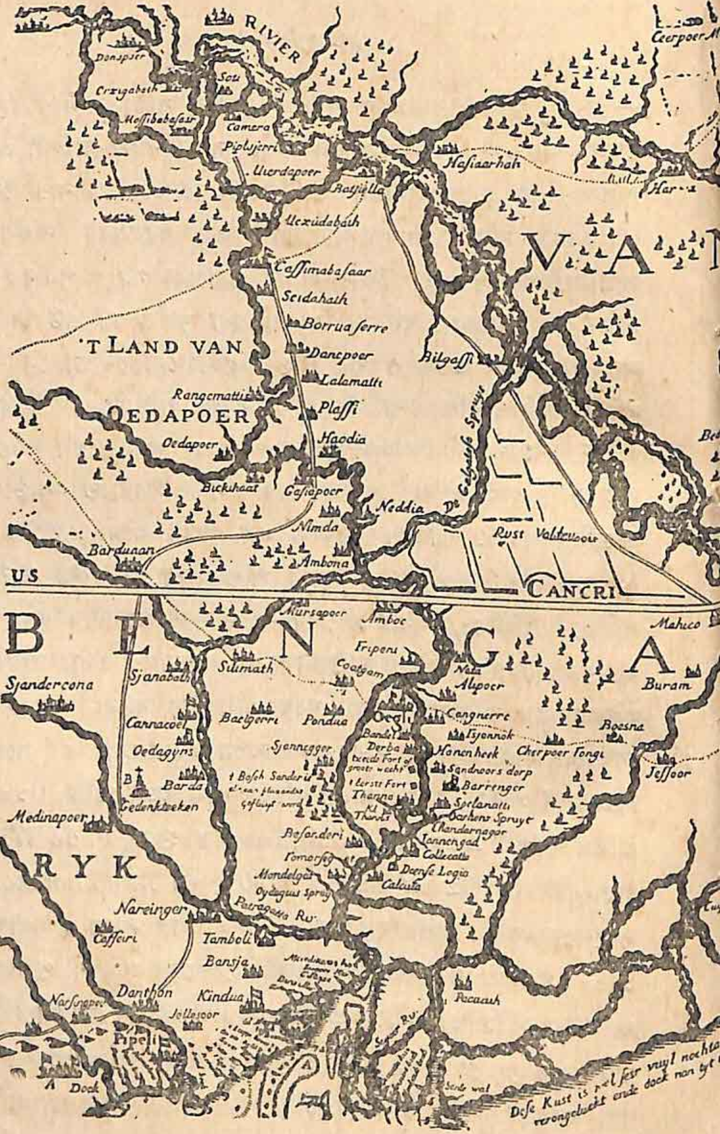
ত্রিবেণী-সংগমের অন্যতম নদী যমুনা, এ-কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। এই যমুনা এখন খুঁজিয়া বাহির করা আয়াসসাধ্য, কিন্তু পঞ্চদশ শতকে বিপ্রদাসের কালে "যমুনা বিশাল অতি"। ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিপ্রদাস বলিতেছেন, "গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি, অধিষ্ঠান উমা মাহেশ্বরী"। রেনেলের নক্‌শায় যমুনা অতি খর্ব ক্ষীণ একটি রেখা মাত্র।

গঙ্গা-ভাগীরথীর দক্ষিণ বা নিম্ন প্রবাহ ছাড়িয়া এইবার উত্তর-প্রবাহের কথা একটু বলা যাইতে পারে। এ-সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ অত্যন্ত কম ; অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। প্রাচীন গৌড়ের প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে এখন ভাগীরথী ও পদ্মা দ্বিধা বিভক্ত হইতেছে, কিন্তু প্রাচীন বাংলায়, অন্ততঃ সপ্তদশ শতকপূর্ব বাংলায়, গৌড়-লক্ষ্মণাবতী ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীরে, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। বস্তুত, ডি বারোস (১৫৫০) এবং গ্যাস্‌টাল্‌ডির (Gastaldi, ১৫৬১) নক্‌শা দুটিতেই গৌড়ের (Gorij ; গ্যাস্‌টাল্‌ডির নক্‌শায় Gaur) অবস্থান গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে, এবং

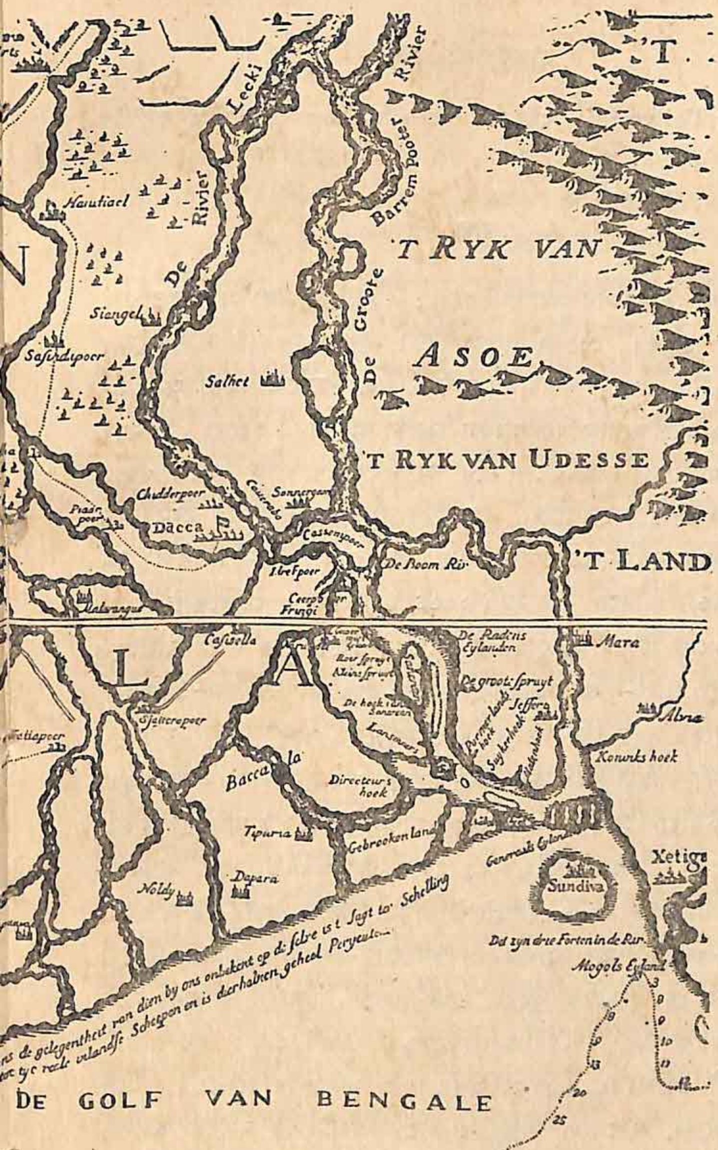
রাঢ় (জাও ডি বারোসের নক্শার Rara) দেশের উত্তরে বা স্বল্প উত্তর-পশ্চিমে। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণ হইতেও মনে হয়, গৌড় ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেই অবস্থিত ছিল। রাজমহল পার হইয়া গঙ্গা খুব সম্ভব তখন খানিকটা উত্তর- ও পূর্ব-বাহিনী হইয়া গৌড়কে পশ্চিম বা ডাইনে রাখিয়া রাঢ়দেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-বাহিনী হইত। বর্তমান কালিন্দী-মহানন্দা খুব সম্ভব এই উত্তর ও পূর্ব প্রবাহ-পথের প্রাচীন স্মৃতি বহন করে। যাহা হউক, ইহা হইতেছে আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতকের কথা ; কিন্তু সপ্তদশ শতকেই গঙ্গা-ভাগীরথী এই পথ পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান পথ প্রবর্তন করিয়াছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকেরও আগে গঙ্গা-ভাগীরথীর উত্তর-প্রবাহের একটি প্রাচীনতর পথ বোধ হয় ছিল, এবং এ-পথটি বর্তমান প্রবাহপথের পশ্চিমে। পূর্ণিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূমের নিম্ন সমভূমি ঘেঁষিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত ঝিল ও নিম্ন জলাভূমিময় এক সুদীর্ঘ দক্ষিণবাহিনী রেখা চলিয়া গিয়াছে। এই রেখা এখনও বর্তমান। এই রেখাই গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীনতম প্রবাহ-পথের নির্দেশক বলিয়া আমার ধারণা। ইহারই নিম্নতর প্রবাহে আমি ইতিপূর্বে দামোদর-সরস্বতী-রূপনারায়ণের কিয়দংশের প্রবাহপথের ইঙ্গিত করিয়াছি। এই সমগ্র প্রবাহপথ সম্বন্ধে আমার ধারণা যে নিছক কল্পনামাত্র নয় তাহা মৎস্তপুরাণোক্ত গঙ্গার প্রবাহপথের বর্ণনা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। মৎস্ত-পুরাণে আছে, কৌশিক (উত্তর-বিহার) ও মগধ (দক্ষিণ-বিহার) পার হইয়া গঙ্গা বিন্ধ্যপর্বতের গাত্রে (রাজমহল-সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম শৈলমূলে) প্রতিহত হইয়া ব্রহ্মোত্তর অর্থাৎ মোটামুটি উত্তর-রাঢ়, বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত দেশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত। ভাগীরথীর পূর্বতীর বঙ্গ, পশ্চিম তীর তাম্রলিপ্ত, উত্তরতর প্রবাহে উত্তর-রাঢ়।

গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহপথের প্রাচীন ইতিহাস এখন এইভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে : (১) ঐতিহাসিক কালের সন্ধান-সম্ভাব্য প্রাচীনতম পথ

—পূর্ণিয়ার দক্ষিণে রাজমহল পার হইয়া গঙ্গা রাজমহল-সাঁওতালভূমি-ছোট-নাগপুর-মানভূম-ধলভূমের তলদেশ দিয়া সোজা দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া সমুদ্রে পড়িত; এই প্রবাহেই ছিল অজয়, দামোদর এবং রূপনারায়ণের সংগম। এই তিনটি নদীই তখন নাতিদীর্ঘ। এই প্রবাহেরই দক্ষিণতম সীমায় তাম্রলিপ্ত বন্দর। (২) ইহার পরের পর্যায়েই গঙ্গার পূর্বদিক যাত্রা শুরু হইয়াছে। রাজমহল হইতে গঙ্গা-ভাগীরথী খুব সম্ভব বর্তমান কালিন্দী ও মহানন্দার খাতে উত্তর ও পূর্ব-বাহিনী হইয়া গৌড়কে ডাইনে রাখিয়া পরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাহিনী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। কিন্তু, তখন এই প্রবাহ ১নং খাতের আরও পূর্বদিকে সরিয়া আসিয়াছে। তবে, তখনও দামোদর এবং রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার জল ভাগীরথীতে পড়িতেছে এবং তাম্রলিপ্ত বন্দরও জীবন্ত। অর্থাৎ, এই পর্যায় অষ্টম শতকের আগেই। (৩) তৃতীয় পর্যায়েও গৌড় গঙ্গার পশ্চিম তীরে; কিন্তু তাম্রলিপ্ত বন্দর পরিত্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ দামোদর-রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার এবং কিছুদিনের জন্য সরস্বতীরও জল লইয়া ভাগীরথীর যে পশ্চিমতর প্রবাহ তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কলিকাতা-বেতড় পর্যন্ত ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহপথের এবং বেতড়ের দক্ষিণে আদিগঙ্গা-পথের প্রবর্তন হইয়াছে। এই পথেরই পরিচয় বিপ্রদাস (১৪৯৫) হইতে আরম্ভ করিয়া ফান্ ডেন্.ব্রোক (১৬৬০), দ্য ল' অভিল (de l' Auville, 1752), এফ্ ডি হ্বিট্ (F. de Witt, 1726), ইজাক্ টিরিয়ন (Izaak Tirion, 1730), থর্ন টন্ (Thornton) প্রভৃতি সকলেরই নক্শায় পাওয়া যাইতেছে। আলীবর্দীর সময়ে (অর্থাৎ, মোটামুটি ১৭৫০) আদিগঙ্গা পরিত্যক্ত হওয়াতে বেতড়ের দক্ষিণে পুরাতন সরস্বতীর খাতে কি করিয়া ভাগীরথীকে প্রবাহিত করা হয় তাহা তো আগেই বলিয়াছি। তাই বোধ হয়, রেনেলের নক্শায় (১৭৬৪-৭০) আদিগঙ্গার কোনও চিহ্নই প্রায় নাই। কর্ণেল টলি (Tolly) সাহেব এই খাতের খানিকটা অংশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৭৮৫); তাঁহার নামানুসারেই Tolly's


RIVIER
Donspser
Crzigabath
Sou
Mossibabasaar
Camera
Piplusjerri
Uerdapoer
Battiella
Hasiaarhah
Ceerpoer
Har
Uexudabath
V A N
Cassimabasaar
Seidahath
Borruasferre
'T LAND VAN
Danepoer
Bilgassi
Lalamatti
Rangematti
OEDAPOER
Plassi
Oedapoer
Haodia
Bickhaat
Gasiapoer
Neddia
Nimda
Rust
Valtevoor
Bardunan
Ambona
US
CANCRI
Mursapoer
Amboc
B E N G A
Mahico
Fripeni
Silmath
Coatgam
Sjanabath
Nata
Alipoer
Buram
Sjandercona
Cannacoel
Baelgerri
Pondua
Oegli
Cangnerre
Boesna
Bandel
Tsjonnok
Oedagyns
Sjannegger
Derba
Honenhoek
Cherpoer Fongi
Jessoor
Barda
Sandnoors dorp
Barrenger
Gedenkteeken
Thanna
Spelanatti
Medinapoer
Barkens Spruyt
Chandernagor
Bosandori
Iannengad
Collecatta
RYK
Deense Logie
Calcutta
Mondelgat
Nareinger
Cassieri
Tamboli
Bansja
Danthon
Kindua
Pacaauh
Narsinapoe
Jellesoor
Pipeli
Dock
Dese Kust is wel seer vuyl nochta
verongeluckt ende dock non tyt

ফান্ ডেন ব্রোকের ন


Lecki
Barrem Pooter Rivier
De Rivier
De Groote
T RYK VAN
ASOE
'T RYK VAN UDESSE
'T LAND
Hautiael
Siengel
Salhet
Chudderpoer
Sonnergam
Dacca
Castenpoer
De Boom Riv
Casisella
De Radins Eylanden
Mara
De groot sprayt
Jeffera
Albra
Konincks hoek
Lansmaers
Bacca
Directeurs hoek
Tipuria
Gebrooken land
Dapara
Noldy
Xetigs
Sundiva
Det zyn drie Forten in de Riv.
Mogols Eyland
DE GOLF VAN BENGALE

কসা (১৬৬০ খ্রী)

Nullah এবং Tollygunje যথাক্রমে এই খাত এবং বামতীরের পল্লীটির বর্তমান নামকরণ।

পদ্মা

ভাগীরথী বা ছোটগঙ্গার কথা বলা হইল ; এইবার বড়গঙ্গা বা পদ্মার কথা বলা যাইতে পারে। রেনেল সাহেব তো ইহাকে গঙ্গাই বলিয়াছেন। আগেই বলিয়াছি, পদ্মা অর্বাচীনা নদী ; কিন্তু পদ্মাকে যতটা অর্বাচীনা পণ্ডিতেরা সাধারণত মনে করিয়া থাকেন ততটা অর্বাচীনা হয়তো সে নয়। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তো মনে করেন ষোড়শ শতক হইতে গঙ্গার পূর্বযাত্রার অর্থাৎ পদ্মার সূত্রপাত। ইহা ইতিহাস-বিরুদ্ধ বলিয়াই যেন মনে হয়। রেনেল ও ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায় পদ্মা বেগবতী নদী। সিহাবুদ্দিন তালিস (১৬৬৬) ও মির্জা নাথনের (১৬৬৪) বিবরণীতে দেখিতেছি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সংগমের উল্লেখ, ইচ্ছামতীর সংগমে ইচ্ছামতীর তীরে যাত্রাপুর এবং তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে ডাকচর, এবং ঢাকার দক্ষিণে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রবাহের সমুদ্রযাত্রা—ভলুয়া এবং সন্দ্বীপের পাশ দিয়া। যাত্রাপুর হইতে ইচ্ছামতী বাহিয়া পথই ছিল তখন ঢাকায় যাইবার সহজতম পথ, এবং সেই পথেই টেভারনিয়ার (১৬৬৬) এবং হেজেস্ (১৬৮২) যাত্রাপুর হইয়া ঢাকা গিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সর্বত্র গঙ্গার এই প্রবাহের পদ্মা নামকরণ দেখিতেছি না। এই নামকরণ দেখিতেছি আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে (১৫৯৬-৯৭), মির্জা নাথনের বহারিস্তান-ই-ঘায়বি গ্রন্থে, ত্রিপুরা রাজমালায় এবং চৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ-প্রসঙ্গে। আবুল ফজলের মতে কাজিহাটার কাছে গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে ; একটি প্রবাহ পূর্ব-বাহিনী হইয়া পদ্মাবতী নাম লইয়া চট্টগ্রামের কাছে গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। মির্জা নাথন বলিতেছেন, করতোয়া বালিয়ার কাছে একটি বড় নদীতে আসিয়া পড়িতেছে ; এই বড় নদীটির নাম অন্যত্র বলা হইয়াছে পদ্মাবতী। ত্রিপুরা-

রাজ বিজয়মাণিক্য ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা হইতে ঢাকায় আসিয়া ইচ্ছামতী বাহিয়া যাত্রাপুরে আসিয়া পদ্মাবতীতে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও (জন্ম, ১৪৮৫) ২২ বৎসর বয়সে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে আসিয়া পদ্মাবতীতে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন, কোনও কোনও চৈতন্য-জীবনীতে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকেই পদ্মা এবং ইচ্ছামতী প্রসিদ্ধা নদী, তাহার কিছু তীর্থ-মহিমাও আছে, এবং ঢাকা পার হইয়া চট্টগ্রামের নিকটে তাহার সাগরমুখ—এ-তথ্য তাহা হইলে অনস্বীকার্য। ষোড়শ শতকের জাও ডি বারোস্ এবং সপ্তদশ শতকের ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায়ও এই তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া কঠিন নয়। পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় কৃত্তিবাস যে এই পদ্মাবতীকেই বলিতেছেন বড়গঙ্গা, তাহা তো আগেই দেখিয়াছি। চতুর্দশ শতকে ইব্‌ন্ বতুতা (১৩৪৫-৪৬) চীন দেশ যাইবার পথে সমুদ্রতীরবর্তী চট্টগ্রামে (Chhadkawan = চাটগাঁ) নামিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রামকে হিন্দুতীর্থ গঙ্গানদী এবং যমুনা (Jaun)-নদীর সংগমস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যমুনা বা Jaun বলিতে বতুতা ব্রহ্মপুত্রকেই বুঝাইতেছেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তিনি বলিতেছেন, "The first town of Bengal, which we entered, was Chhadkawan (Chittagong), situated on the shore of the vast ocean. The river Ganga, to which the Hindus go in pilgrimage, and the river Jaun (Jamuna) have united near it before falling into the sea." তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অন্তত চতুর্দশ শতকেও গঙ্গার পদ্মাবতী-প্রবাহ চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তাহার অদূরে সেই প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র-প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হইত। তটভূমি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম এখন অনেক পূর্ব-দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে, ঢাকাও এখন আর গঙ্গাপদ্মার উপরে অবস্থিত নয়। পদ্মা এখন অনেক দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে, ঢাকা এখন পুরাতন গঙ্গা-পদ্মার খাত অর্থাৎ বুড়ীগঙ্গার উপর অবস্থিত; আর, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের (অর্থাৎ, যমুনার) সংগম এখন গোয়ালন্দের অদূরে। এই মিলিত প্রবাহ

আরও পূর্ব-দক্ষিণে গিয়া চাঁদপুরের অদূরে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হইয়া সন্দীপের (স্বর্ণদ্বীপ =সোনাদ্বীপ—সন্দীপ ?) নিকট গিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। বস্তুত, সমতটীয় বাংলায়, বিশেষত তাহার পূর্বাঞ্চলে বরিশাল হইতে আরম্ভ করিয়া চাঁদপুর পর্যন্ত, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা যে কী পরিমাণে ভাঙ্গাগড়া চালাইয়াছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, তাহা জাও ডি বারোস হইতে আরম্ভ করিয়া রেনেল পর্যন্ত নক্‌শাগুলো বিশ্লেষণ করিলে খানিকটা ধারণাগত হয়। কিন্তু তাহা আলোচনার স্থান এখানে নয়। প্রাচীন বাংলায় গঙ্গার এই পূর্ব-প্রবাহের অর্থাৎ পদ্মা বা পদ্মাবতীর আকৃতি-প্রকৃতি কি ছিল তাহাই আলোচ্য। পঞ্চদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতক পর্যন্ত পদ্মার প্রবাহপথের অদলবদল বহু-আলোচিত ; কাজেই, এখানে তাহার পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই।

গড়াই : মধুমতী : শিলাইদহ

চতুর্দশ শতকে ইবন্‌ বতুতার বিবরণের আগে বহুদিন এই প্রবাহের কোনও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। দশম শতকের শেষে একাদশ শতকের গোড়ায় চন্দ্রবংশীয় রাজারা বিক্রমপুর-চন্দ্রদ্বীপ-হরিকেল অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের অনেকাংশ জুড়িয়া রাজত্ব করিতেন। এই বংশের মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র তাঁহার ইদিলপুর পট্টোলী দ্বারা 'সতট-পদ্মাবতী বিষয়ের' অন্তর্গত 'কুমারতালক মণ্ডলে' একখণ্ড ভূমিদান করিয়াছিলেন। সতট-পদ্মাবতী বিষয় পদ্মানদীর দুই তীরবর্তী প্রদেশকে বুঝাইতেছে, সন্দেহ নাই ; পদ্মাবতীও নিঃসন্দেহে আবুল ফজল, ত্রিপুরা রাজমালা, চৈতন্যজীবনী প্রভৃতিতে উল্লিখিত পদ্মাবতী তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই। কুমারতালক মণ্ডলের উল্লেখ আরও লক্ষ্যণীয়। কুমারতালক, এবং বর্তমান গড়াই নদীর অদূরে নদীয়ার অন্তর্গত কুমারখালি দুইই কুমার নদীর ইঙ্গিত বহন করে, তাহা নিঃসন্দেহ। বর্তমান

কুমার নদী পদ্মা-উৎসারিতা মাথাভাঙ্গা নদী হইতে বাহির হইয়া বর্তমান গড়াইর সঙ্গে মিলিত হইয়া বিভিন্ন অংশে গড়াই, মধুমতী, শিলা(ই)দহ, বালেশ্বর নাম লইয়া হরিণঘাটায় গিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। এ-অনুমান যুক্তিসংগত যে, এই সমগ্র প্রবাহটিরই যথার্থ নাম ছিল কুমার এবং কুমারই পরে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। তবে শিলা(ই)দহ নামটি পুরাতন বলিয়াই যেন মনে হয়। ফরিদপুরে প্রাপ্ত ধর্মাদিত্যের একটি পট্টোলীতে শিলাকুণ্ড নামে একটি জলাশয়ের উল্লেখ আছে। শিলাকুণ্ড ও শিলা(ই)দহ একই নাম হইতেও পারে; দুয়েরই অর্থ প্রায় এক। এই কুমার নদীর সাগর-মোহানার মুখ হরিণ-ঘাট বা কৌমারকই বোধ হয় (দ্বিতীয় শতকের) টলেমির গঙ্গার পঞ্চমুখের তৃতীয় মুখ কাম্বেরীখন (Kamberikhon)। যাহা হউক, সতট-পদ্মাবতী বিষয়ের উল্লেখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, দশম-একাদশ শতকেই পদ্মা বা পদ্মাবতীর প্রবাহ ইদিলপুর-বিক্রমপুর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং ঐ দিক দিয়াই বোধ হয় সাগরে প্রবাহিত হইত; কুমারতালক মণ্ডলের (যে-কুমার নদীর তল বা অববাহিকা, নদীর দুই ধারের নিম্নভূমি) উল্লেখ হইতে অনুমান হয় কুমার নদীও তখন বর্তমান ছিল এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে তাহার যোগও ছিল। সাত শত বৎসর পর রেনেলের নক্শায় তাহা লক্ষ্য করা যায়, এবং গড়াই-মধুমতী-শিলা(ই)দহ-বালেশ্বর যদি কুমারের সঙ্গে অভিন্ন না হয় তাহা হইলে সে-যোগ এখনও বর্তমান।

ইদিলপুর পট্টোলীর প্রায় সমসাময়িক একটি সাহিত্যগ্রন্থেও বোধ হয় গুহ্য রূপকছলে পদ্মানদীর উল্লেখ আছে। দশম-দ্বাদশ শতকের বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম সাধনার গুহ্য আচার-আচরণ সম্বন্ধে প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় যে-সমস্ত পদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয়ের কল্যাণে আজ সুপরিচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি পদের প্রথম চার লাইন এইরূপ :

বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ॥

আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥

—৪৯ নং পদ, ভুসুকু সিদ্ধাচার্যের রচনা

সিদ্ধাচার্য ভুসুকু একাদশ শতকের মধ্যভাগের লোক। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ মনে করেন ভুসুকু তাঁহার গুরু দীপংকর-অতীশ-শ্রীজ্ঞানের পঞ্চশিষ্যের অন্যতম এবং "এই বাঙ্গাল দেশেরই এক প্রাচীন কবি।" উদ্ধৃত লাইন চারিটির আপাত অর্থ এই: 'পদ্মাখালে বজ্রনৌকা পাড়ি বাহিতেছি। অদ্বয়-বঙ্গালে ক্লেশ লুটিয়া লইল। ভুসু, তুই আজ (যথার্থ) বঙ্গালী হইলি। চণ্ডালিকে তুই নিজ ঘরণী করিয়া লইয়াছিস্।' এখানে পদ্মাখাল, বঙ্গাল, বঙ্গালী প্রভৃতি শব্দের এবং সমস্ত পদটির সহজিয়া মতানুগত গুহ্য অর্থ তো আছেই, তবে সেই গুহ্য অর্থ গড়িয়া উঠিয়াছে কয়েকটি বস্তুসম্পর্কগত শব্দকে অবলম্বন করিয়া। ভুসুকু বঙ্গালী অর্থাৎ পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গবাসী ছিলেন। ১০২১-২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রচোল দক্ষিণ-রাঢ়ের পরেই বঙ্গাল দেশ জয় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্বতীরে বর্তমান পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গই বঙ্গালদেশ এবং এই বঙ্গালদেশ অন্তত বিক্রমপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি যখন বঙ্গালী, এবং বঙ্গাল দেশের সঙ্গে ভুসুকু যখন পদ্মাখালের কথা বলিতেছেন, তখন পঁউআ খাঁল এবং পদ্মাবতী নদী যে এক এবং অভিন্ন, একথা স্বীকার করিতে আপত্তি হইবার কারণ নাই। তাহা হইলে, ইদিলপুর লিপি এবং ভুসুকুর এই পদটিই পদ্মা বা পদ্মাবতী নদীর প্রাচীনতম নিঃসংশয় ঐতিহাসিক উল্লেখ। তবে, পদ্মা তখনও হয়তো এত বড় নদী হইয়া উঠে নাই; বোধ হয় খালোপমই ছিল।

দশম-একাদশ শতকে পদ্মার উল্লেখ দেখা গেল। কিন্তু পদ্মা যে গঙ্গা-ভাগীরথীর অন্যতম শাখা, খুব প্রাচীন লোকস্মৃতির মধ্যে তাহা বিধৃত হইয়া আছে। দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা-ভাগীরথী হইতে পদ্মার উৎপত্তিকাহিনী বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, দেবী ভাগবত, মহাভাগবত পুরাণ এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদি-কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের একটিও অবশ্য খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের

আগের রচিত গ্রন্থ নয়, কিন্তু কাহিনীগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বযাত্রায় প্রবাহপথ অর্থাৎ পদ্মা দশম-একাদশ শতক হইতেও প্রাচীন। তবে, তখন বোধ হয় পদ্মা এত প্রশস্তা ও বেগবতী নদী ছিল না, হয়তো ক্ষীণতোয়া সংকীর্ণ ধারাই ছিল। তাহা না হইলে কামরূপ হইতে সমতট যাইবার পথে য়ুয়ান-চোয়াঙ্‌কে এই নদীটি পার হইতে হইত এবং তাঁহার বিবরণীতে আমরা নদীটির উল্লেখও পাইতাম। এই অনুল্লেখ হইতে মনে হয় পদ্মা তখন উল্লেখযোগ্য নদী ছিল না। তাহা ছাড়া, ষষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি হিমবচ্ছিখর হইতে দ্বাদশ শতকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ; পদ্মা আজিকার মতন ভীষণা প্রশস্তা হইলে হয়তো একই ভুক্তি পদ্মার দুই তীরে বিস্তৃত হইত না। জ্যোতির্বেত্তা ও ভৌগোলিক টলেমি (150 A. D.) তাঁহার আন্তর্গাঙ্গেয় (India intra-Gangem) ভারতবর্ষের নকশা ও বিবরণীতে তদানীন্তন গঙ্গা-প্রবাহের সাগরসংগমে পাঁচটি মুখের উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমির নক্‌শা ও বিবরণ নানা দোষে দুষ্ট এবং সর্বত্র সকল বিষয়ে খুব নির্ভরযোগ্যও নয়। তবু, তাঁহার সাক্ষ্য এবং পরবর্তী ঐতিহাসিক উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া কিছু কিছু অনুমান ঐতিহাসিকেরা করিয়াছেন, এবং এইসব মোহানা অবলম্বনে প্রাচীন ভাগীরথী-পদ্মার প্রবাহ-পথেরও কিছু আভাস দিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা শক্ত ; তবে মোটামুটি মতামতগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে যথাক্রমে এই মোহানাগুলির নাম : (১) Kambyson; তারপর Poloura নামে নগর ; (২) Mega (great) ; (৩) Kamberikhon ; তারপর Tilogrammon নামে এক নগর ; (৪) Pseudostomon (false mouth) ; এবং সর্বশেষে পূর্বতম মোহানা (৫) Antibole (thrown back) । নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই মোহানাগুলিকে যথাক্রমে (১) তাম্রলিপ্ত-নিকটবর্তী গঙ্গাসাগর মুখ, (২) আদিগঙ্গা বা রায়মঙ্গল-হরিয়াভাঙ্গা মুখ, (৩) কুমার-হরিণঘাটা মুখ, (৪) দক্ষিণ-সাহাবাজপুর মুখ, এবং (৫) সন্দীপ-চট্টগ্রাম-

মধ্যবর্তী আড়িয়ল খাঁ নদীর নিম্নতম প্রবাহমুখ বলিয়া মনে করেন। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় মনে করেন, (১) কালিদাস-কথিত কপিশা বা বর্তমান কাসাইর মুখ, (২) ভাগীরথীর সাগরমুখ, (৩) কুমার-কুমারক-হরিণঘাটা মুখ, (৪) পদ্মা-মেঘনার সম্মিলিত প্রবাহমুখ, এবং (৫) বুড়ীগঙ্গা মুখই যথাক্রমে টলেমি-কথিত গঙ্গার পঞ্চমুখ। এই দুই মতের মধ্যে ১ ও ২নং ছাড়া আর কোথাও খুব মুলগত বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই ; ২নং মুখের পার্থক্যও খুব মূলগত নয়। ৩, ৪ ও ৫ নং মুখ সম্বন্ধে যদি সদ্যোক্ত মত দুইটি সত্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হয় টলেমির সময়েই অন্তত ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চল পর্যন্ত গঙ্গার পূর্ব-দক্ষিণবাহী প্রবাহপথ অর্থাৎ পদ্মার প্রবাহপথের অস্তিত্ব ছিল। খুব অসম্ভব নাও হইতে পারে, তবে এসম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

ধলেশ্বরী : বুড়ীগঙ্গা

পদ্মার প্রাচীনতম প্রবাহপথের নিশানা সম্বন্ধেও নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। ফান্ ডেন্ ব্রোকের (১৬৬০) নক্শায় দেখা যাইতেছে, পদ্মার প্রশস্ততর প্রবাহের গতি ফরিদপুর-বাখরগঞ্জের ভিতর দিয়া দক্ষিণ-সাহাবাজপুরের দিকে। কিন্তু, ঐ নক্শাতেই প্রাচীনতর পথটিরও কিছুটা ইঙ্গিত বোধ হয় আছে। এই পথটি রাজসাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ার পাশ দিয়া চলন বিলের ভিতর দিয়া ধলেশ্বরীর খাত দিয়া ঢাকার পাশ দিয়া মেঘনা-খাড়িতে গিয়া সমুদ্রে মিশিত। ঢাকার পাশের নদীটিকে যে বুড়ীগঙ্গা বলা হয়, তাহা এই কারণেই ; ঐ বুড়ী-গঙ্গাই প্রাচীন পদ্মা-গঙ্গার খাত। কিন্তু তাহারও আগে কোন্ পথে পদ্মা প্রবাহিত হইত, সে-সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন।

জলাঙ্গী : চন্দনা : ভৈরব :
মধুমতী : আড়িয়ল খাঁ

পদ্মার প্রধান প্রবাহ ছাড়া পদ্মা হইতে উৎসারিত আরও কয়েকটি নদীর প্রবাহপথে ভাগীরথী-পদ্মার জল নিষ্কাশিত হয়। ইহাদের ভিতর জলাঙ্গী এবং

চন্দনা নদী দুইটি পদ্মা হইতে ভাগীরথীতে প্রবাহিত ; এবং দুইটি নদীই ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায় দেখানো আছে। চন্দনা তদানীন্তন যশোহরের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। পদ্মা হইতে সমুদ্রে প্রবাহিত প্রাচীন নদীগুলির মধ্যে কুমারই প্রধান এবং প্রাচীনতম। কিন্তু, কুমার এখন মরণোন্মুখ। মধ্যযুগে এই নদীগুলির মধ্যে ভৈরবও ছিল অন্যতম ; সেই ভৈরবও মরণোন্মুখ। বর্তমানে সাগরগামী পদ্মাশাখাগুলির মধ্যে মধুমতী ও আড়িয়ল খাঁই প্রধান। ধলেশ্বরী-বুড়ীগঙ্গা যেমন পদ্মার উত্তরতম প্রবাহপথের স্মারক, আড়িয়ল খাঁ (মির্জা নাথনের অগুল খাঁ) তেমনই দক্ষিণতম প্রবাহপথের দ্যোতক। যাহা হউক, মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁ, এই দুইটি নদীর অস্তিত্ব সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের নক্শাগুলিতেই দেখা যাইতেছে, যদিও বর্তমানে প্রবাহপথের অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে।

বাংলার খাড়ি, ভাটি

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভাগীরথী পদ্মার বিভিন্ন প্রবাহপথের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস অনুসরণ করিলেই বুঝা যায়, এই দুই নদীর মধ্যবর্তী সমতটীয় ভূভাগে, অর্থাৎ নদী দুইটির অসংখ্য খাড়ি-খাড়িকাকে লইয়া কি তুমুল বিপ্লবই না চলিয়াছে যুগের পর যুগ। এই দুইটি নদী এবং তাহাদের অগণিত শাখা-প্রশাখা বাহিত সুবিপুল পলিমাটি ভাগীরথী-পদ্মামধ্যবর্তী খাড়িময় ভূভাগকে বারবার তছনছ করিয়া বারবার তাহার রূপ পরিবর্তন করিয়াছে। পদ্মার খাড়িতে ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর তীরে ডায়মণ্ড হারবারের সাগরসংগম পর্যন্ত বাখরগঞ্জ, খুলনা, চব্বিশ-পরগণার নিম্নভূমি ঐতিহাসিক কালেই কখনও সমৃদ্ধ জনপদ, কখনও গভীর অরণ্য, অথবা অনাবাসযোগ্য জলাভূমি, কখনও বা নদীগর্ভে বিলীন, আবার কখনও খাড়ি-খাড়িকা অন্তর্হিত হইয়া নূতন স্থলভূমির সৃষ্টি। ফরিদপুর জেলার কোটালি-পাড়া অঞ্চল ষষ্ঠ শতকের একাধিক তাম্রপট্টোলীতে নব্যাবকাশিকা বলিয়া

অভিহিত হইয়াছে। নব্যাবকাশিকা সেই ভূমি যে-ভূমি বা অবকাশ নূতন সৃষ্ট হইয়াছে। ষষ্ঠ শতকে নব্যাবকাশিকা সমৃদ্ধ জনপদ এবং নৌ-বাণিজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ কেন্দ্র, অথচ আজ এই অঞ্চল নিম্নজলাভূমি। পট্টোলীগুলি হইতে মনে হয়, নৌকাদ্বারাই এইসব অঞ্চলে যাওয়া আসা করিতে হইত। আশ্চর্যের বিষয় এই ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে সেনরাজ বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষৎ লিপিতে বঙ্গের নাব্য অঞ্চলে রামসিদ্ধি পাটক নামে একটি গ্রামের উল্লেখ আছে। এই গ্রাম বাখরগঞ্জ জেলার গৌরনদী অঞ্চলে। এই নাব্য অঞ্চলেরই অন্তর্ভুক্ত বিনয়তিলক গ্রামের পূর্ব-সীমায় ছিল সমুদ্র। শ্রীচন্দ্রের (দশম-একাদশ শতক) রামপাল পট্টোলীতে নান্য-মণ্ডলের উল্লেখ আছে; কেহ কেহ মনে করেন ইহার যথার্থ পাঠ নাব্য-মণ্ডল, এবং ঐ পট্টোলীর নাব্যমণ্ডলান্তর্গত নেহকাষ্ঠি গ্রাম বাখরগঞ্জ জেলার বর্তমান নৈকাঠি গ্রাম। এই অনুমান মিথ্যা নয় বলিয়াই মনে হয়। যাহাই হউক, প্রাচীন বাংলায় নব্যাবকাশিকা নবসৃষ্ট ভূমি এবং ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ অঞ্চল নাব্য অর্থাৎ নৌ-যাতায়াতলভ্য এবং তাহার পূর্ব সীমায় সমুদ্র। খুলনার নিম্ন অঞ্চলে তো ভাঙ্গা-গড়া মধ্যযুগে এবং খুব সাম্প্রতিক কালেও চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে। মধ্যযুগে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা, তারনাথ প্রভৃতি লেখকেরা, ময়নামতীর গানের রচয়িতা প্রভৃতি ভাগীরথীর পূর্বতীর হইতে সুবা বাংলার পূর্বদিকে বেঙ্গলা (Bengala = ঢাকার বাঙ্গালা-বাজার ?) পর্যন্ত, বোধ হয় চট্টগ্রাম পর্যন্ত, সমস্ত নিম্নাঞ্চলটাকেই বাটি বা ভাটি নামে অভিহিত করিয়াছেন। আবুল ফজল বাটি বা ভাটি বলিতে সুবা বাংলার পূর্বাঞ্চল বুঝিয়াছেন। মানিকচন্দ্র রাজার গানেও "ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি"—এই ভাটিরও ইঙ্গিত সমুদ্রশায়ী এই সব খাড়ি-খাড়িকাময় নিম্নভূমির দিকে, অর্থাৎ, বঙ্গালভূমির দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে। এই ভাটিরই কিয়দংশ (পূর্ব-মৈমনসিং ও ত্রিপুরা অঞ্চল) প্রাচীন বাংলার সমতট, এইরূপ অনুমান বোধ হয় খুব অসংগত নয়। অর্থের দিক হইতে সমতট হইতেছে সেই ভূমি যে-ভূমি

(সমুদ্র)-তটের সঙ্গে সমান, অর্থাৎ জোয়ারের জল যে-পর্যন্ত প্রবেশ করে; ভাটি অর্থও প্রায় তাহাই।

সুন্দরবন

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলে—চব্বিশপরগণা-খুলনা-বাখরগঞ্জের নিম্নভূমিতে; এবং সমস্ত পরিবর্তনটাই ঘটিয়াছে মধ্যযুগে। কারণ, এই অঞ্চলের পশ্চিম দিকটায় অর্থাৎ চব্বিশ-পরগণা জেলার নিম্নাঞ্চলে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সমানে সমৃদ্ধ ঘন বসতিপূর্ণ জনপদের চিহ্ন প্রায়ই আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। জয়নগর থানায় কাশীপুর গ্রামের সূর্যমূর্তি (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক); ডায়মণ্ড-হারবারের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বকুলতলা গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের পট্টোলী (দ্বাদশ শতক), এবং ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মলয় নামক স্থানে প্রাপ্ত জয়নাগের তাম্র-পট্টোলী (সপ্তম শতক); রাক্ষসখালি দ্বীপে প্রাপ্ত ডোম্মনপালের পট্টোলী (দ্বাদশ শতক), ঐ দ্বীপেই প্রাপ্ত লিপি-উৎকীর্ণ এক ঝাঁক মাটির শীলমোহর (একাদশ শতক); খাড়ি পরগণায় প্রাপ্ত অসংখ্য পাথরের মূর্তি, দুই চারিটি ভগ্নমন্দির, কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপ্তমুদ্রা, ইত্যাদি সমস্তই চব্বিশ-পরগণা জেলার নিম্নভূমিতে প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ জনপদের ইঙ্গিত বহন করে। সেন রাজাদের ও ডোম্মন-পালের আমলে খাড়িমণ্ডল ও খাড়িবিষয় পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ বিভাগই ছিল। অথচ, আজ এই সব অঞ্চল প্রায় পরিত্যক্ত! কিছুদিন আগে তো সমস্তটা জুড়িয়া গভীর অরণ্যই ছিল, এখনও বহু অংশেই অরণ্য; কিছু কিছু অংশে মাত্র নূতন আবাদ ও বসতি হইতেছে। খুলনার দিকে এবং বাখরগঞ্জের কিয়দংশে তো এখনও গভীর অরণ্য। রাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ (Ralph Fitch, 1583-91) বলিতেছেন, Bengala-দেশ ব্যাঘ্র, বন্য-মহিষ ও বন্য-মুরগী (হাঁস) অধ্যুষিত বনময় জলাভূমি। ধর্মপালের খালিমপুর লিপি,

দেবপালের নালন্দা লিপি এবং লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া লিপিতে ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল নামে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত একটি স্থানের উল্লেখ আছে। নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে (যে-সমুদ্রতট ব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত) মনে হয় চব্বিশ-পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জের দিকেই যেন স্থানটির ইঙ্গিত। এ-অনুমান সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয়, নবম-দ্বাদশ শতকে দক্ষিণ-বঙ্গের অন্তত কিয়দংশ গভীর অরণ্যময় ছিল।

আকবরের আমলে ঈশা খাঁ আফ্‌গান ভাটি অঞ্চলের সামন্তপ্রভু ছিলেন; সেই সময়ে মাহমুদাবাদ ও খালফাতাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল বর্তমান ফরিদপুর, যশোর এবং নোয়াখালি জেলার কিয়দংশ, এবং এই দুই সরকারান্তর্গত বহুলাংশ গভীর অরণ্যময় ছিল। খান জাহান আলীর আমলে (ষোড়শ শতকে) যশোর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে গভীর অরণ্য; তিনি সুন্দরবনের অনেক অংশে নূতন আবাদ করাইয়াছিলেন। য়ুসুফ্‌ সাহ্‌, সৈয়দ হোসেন সাহ, নসরৎ সাহ (১৪৯৪, ১৪৯৪, ১৫২০) প্রভৃতি সুলতানেরাও এই সব অরণ্যের কিছু কিছু নূতন আবাদ করাইয়াছিলেন, প্রধানত ফরিদপুর ও যশোরে। এই দুই জেলার অনেক অংশ ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল; বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে ফতেহাবাদের উল্লেখ আছে (পঞ্চদশ শতক)। জেসুইট্‌ পাদ্রী ফরনান্‌ডিজ্‌ (Fernandus, 1598) হুগলি হইতে শ্রীপুর (খুলনা জেলায় ইচ্ছামতীর তীরে, বর্তমান টাকির উল্টা দিকে) হইয়া চট্টগ্রামের সমস্ত পথটাই ব্যাঘ্রসংকুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক বৎসর পরে ফন্‌সেকা (Fonseca, 1599) বাকলা হইতে সপ্তগ্রামের (সাতগাঁ = Chandeecan) পথ বানর ও হরিণ অধ্যুষিত বনময় ভূমি বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। পূর্বোক্ত ফিচ্‌ সাহেব (১৫৮৩-৯১) বলিতেছেন, বাকলা বন্দরের পাশ ঘিরিয়াই জঙ্গল। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে প্রতাপাদিত্য যশোরে সুন্দরবন অঞ্চলেই নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রয়োদশ শতকের পর কোনো সময় চব্বিশ-পরগণা জেলার নিম্নভূমি কোনো অজ্ঞাত অনির্ধারিত

কারণে পরিত্যক্ত হয়; এই কারণ কোনো প্রাকৃতিক কারণ হইতে পারে, কোনোও রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কারণও হইতে পারে। তাহার পর হইতেই এই অঞ্চল গভীর অরণ্যময়। যশোর, খুলনা ও ফরিদপুর-বাখরগঞ্জের কিছু কিছু নিম্নভূমি হিন্দু-আমলেই ধীরে ধীরে ক্রমশ সমৃদ্ধ জনপদে গড়িয়া উঠিতেছিল, এবং নূতন নূতন আবাদ তথাকথিত পাঠান আমলেও নূতন জনপদ গড়িয়া তুলিতেছিল; কিন্তু প্রকৃতির তাণ্ডব এবং মানুষের ধ্বংসলীলা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকেই ইহার উপর যবনিকা টানিয়া দেয়। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় ফতেহাবাদ সরকারে অসংখ্য ঘরবাড়ি, নৌকা, এবং দুই লক্ষ লোক নষ্ট হইয়া যায়। ইহার উপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উন্মত্ত হত্যা ও লুণ্ঠনলীলা; এবং তাহার ফলে বাখরগঞ্জ এবং খুলনার নিম্নভূমি একেবারে জনমানবহীন গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়া গেল। রেনেলের নক্শায় (১৭৬১) দেখা যাইবে, বাখরগঞ্জ জেলার সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল জুড়িয়া লেখা আছে, "মগদের অত্যাচারে পরিত্যক্ত জনমানবহীন" ("Country depopulated by the Maghs")।

লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র

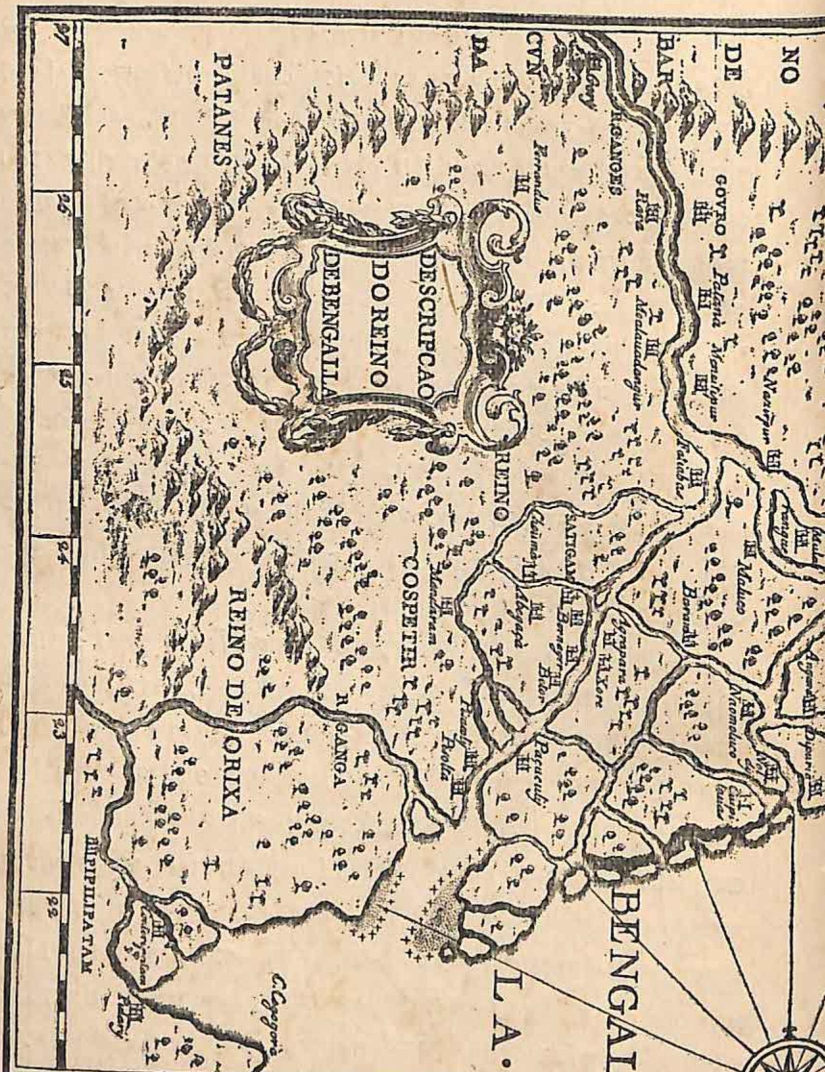
লক্ষ্যা

পদ্মার পূর্ব-দক্ষিণতম প্রবাহে উত্তর হইতে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র অতি প্রাচীন নদ এবং তাহার তীর্থ-মহিমাও নেহাৎ অর্বাচীন নয়। ততটা না হউক, ব্রহ্মপুত্রও পদ্মা-ভাগীরথীর ন্যায় অন্তত কয়েকবার খাত পরিবর্তন করিয়া যমুনা-পদ্মার পথে বর্তমান খাত গ্রহণ করিয়াছে এবং চাঁদপুরের দক্ষিণে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হইয়া সমুদ্রে অবতরণ করিয়াছে। গারো পাহাড়ের পশ্চিমের মোড় পর্যন্ত উত্তর-প্রবাহে লৌহিত্যের খাত পরিবর্তনের প্রমাণ বিশেষ কিছু নাই; পার্বত্যপথ, খাত পরিবর্তনের সুযোগও কম। কিন্তু, গারো পাহাড়ের পশ্চিম-দক্ষিণ মোড় ঘুরিয়াই লৌহিত্য

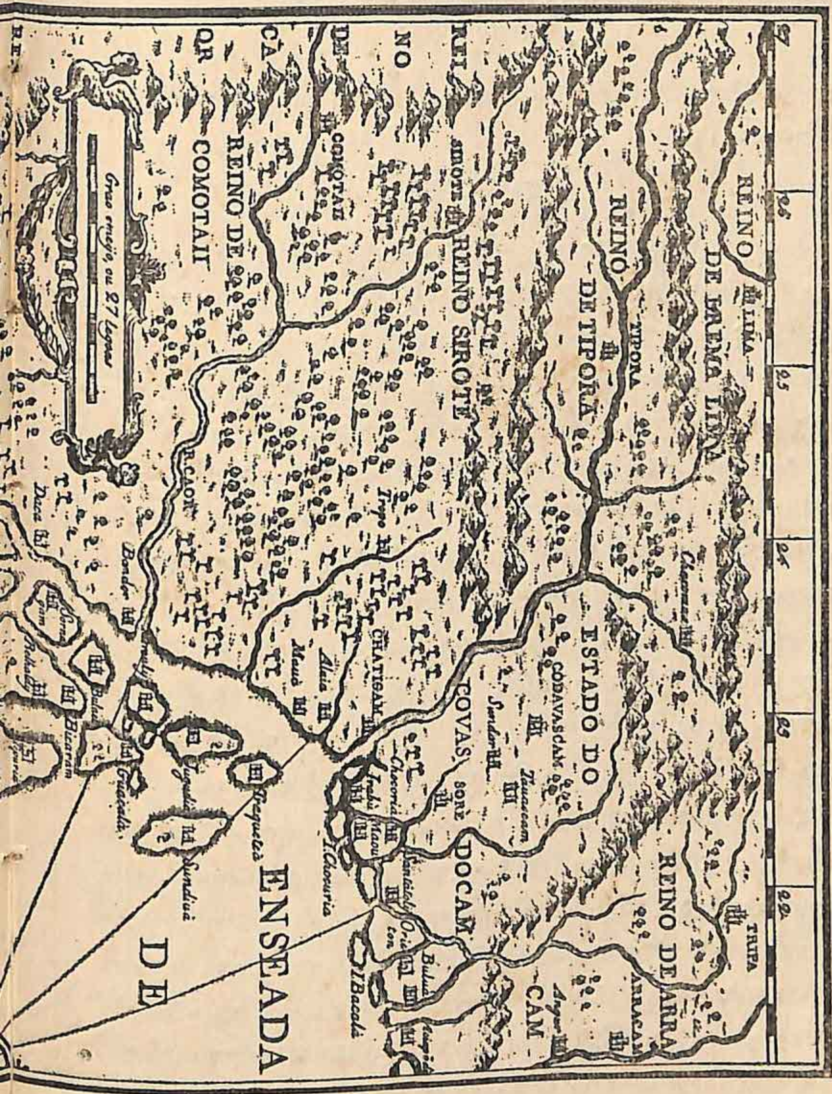
ঐ পাহাড়ের পূর্ব-দক্ষিণ তলভূমি ঘেঁষিয়া, দেওয়ানগঞ্জের পাশ দিয়া, শেরপুর-জামালপুরের ভিতর দিয়া, মধুপুর গড়ের পাশ দিয়া, মৈমনসিংহ জেলাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, বর্তমান ঢাকা জেলার পূর্বাঞ্চল ভেদ করিয়া, সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁ'র দক্ষিণ-পশ্চিমে লাঙ্গলবন্দের পাশ দিয়া ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হইত। এই খাত এখনও বর্তমান, কিন্তু বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে প্রায় মৃত বলিলেই চলে। এই খাতই প্রাচীন, এবং ব্রহ্মপুত্রের যাহা কিছু তীর্থমহিমা তাহা এই খাতেরই। এখনও জামালপুর-মৈমনসিংহ-লাঙ্গলবন্দে অষ্টমী-স্নান পূর্ব-বাংলার অন্যতম প্রধান তীর্থোৎসব। ফান্ ডেন্ ব্রোক (১৬৬০), ইজাক্ টিরিয়ন (১৭৩০) এবং থর্নটনের নক্শায় Salhet (Sylhet) বা শ্রীহট্টকে কেন যে এই প্রবাহপথের পশ্চিমে দেখান হইয়াছে তাহা বলা শক্ত; শ্রীহট্টের অবস্থিতি সম্বন্ধে বোধ হয় ইঁহাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান কিছু ছিল না। রেনেল (১৭৬৪-১৭৭৬) কিন্তু শ্রীহট্টের অবস্থিতি ঠিক দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, ঢাকা জেলার উত্তরে এই ব্রহ্মপুত্র প্রবাহেরই ডান দিক হইতে একটি শাখা-প্রবাহ নির্গত হইয়াছে; ইহার নাম লক্ষ্যা (শীতললক্ষ্যা বা শীতলক্ষ্যা) বা ফান্ ডেন্ ব্রোকের Lecki। লক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিক দিয়া ব্রহ্মপুত্রেরই সমান্তরালে প্রবাহিত হইয়া বর্তমান ঢাকার দক্ষিণে (ব্রহ্মপুত্র-ধলেশ্বরী সংগমের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে) নারায়ণগঞ্জের নিকটে ধলেশ্বরীর সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইত। লক্ষ্যার এই প্রবাহ এখনও বর্তমান কিন্তু ধারা ক্ষীণ, অথচ ফান্ ডেন্ ব্রোকের আমলে এবং তারপরে উনবিংশ শতকের গোড়ায়ও লক্ষ্যা বেগবতী প্রশস্তা নদী। লক্ষ্যার কথা ছাড়িয়া ব্রহ্মপুত্রের মূল প্রবাহে ফিরিয়া আসা যাইতে পারে। ফান্ ডেন্ ব্রোক্, ইজাক্ টিরিয়ন, থর্নটন, রেনেল ইত্যাদি সকলের নক্শা আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে, সপ্তদশ শতকে ফান্ ডেন্ ব্রোকের আগেই ব্রহ্মপুত্র এই খাত পরিত্যাগ করিয়াছিল। কারণ, এই নক্শাগুলিতে দেখা যায় ব্রহ্মপুত্র আর ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হইতেছে না; বর্তমান ঢাকা জেলার সীমায় পৌছিবার অব্যবহিত পূর্বে মৈমনসিংহের

ভিতর দিয়া আসিয়া পূর্ব-দক্ষিণতম কোণে ভৈরব-বাজার বন্দরের নিকট উত্তরাগত সুরমা-মেঘনার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের মিলন ঘটিতেছে, এবং উভয়ের সম্মিলিত ধারা চাঁদপুরের দক্ষিণে সন্দ্বীপের উত্তরে গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। ভৈরব-বাজারের নিকট হইতে সমুদ্র পর্যন্ত এই ধারা রেনেলের সময়েও মেঘনা (Megna) নামেই খ্যাত। ব্রহ্মপুত্রের সদ্যোক্ত প্রবাহই তাহার পূর্বতম প্রবাহ; কিন্তু ব্রহ্মপুত্র এই প্রবাহও পরিত্যাগ করে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কোনও সময়ে; জলপ্রবাহ এখনও বিদ্যমান কিন্তু ধারা ক্ষীণ এবং গ্রীষ্মে মৃতপ্রায়। মেঘনা প্রধানত তাহার নিজের জলরাশিই সমুদ্রে নিষ্কাশিত করে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি হইতে ব্রহ্মপুত্রের অন্যতম শাখা যমুনা প্রবলতরা হইয়া উঠে, এবং বর্তমানে মৈমনসিংহের উত্তর-পশ্চিমতম কোণে ফুলছড়ির নিকট হইতে উৎসারিতা, বগুড়া-পাবনার পূর্বসীমা-বাহিতা এই যমুনাই ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি বহন করিয়া আনিয়া এখন গোয়ালন্দের কাছে পদ্মা-প্রবাহে ঢালিয়া দিতেছে।

সপ্তদশ শতক হইতে লৌহিত্য-ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ-ইতিহাস সুস্পষ্ট; তাহার আগেকার ইতিহাসও কতকটা ধরিতে পারা কঠিন নয়, এবং দেওয়ানগঞ্জ-জামালপুর-লাঙ্গলবন্দ-ধলেশ্বরীর পথে সে-ইঙ্গিতও কিছু পাওয়া যাইতেছে। এ-পথ চতুর্দশ-ষোড়শ শতকের হইতে পারে, প্রাচীনতরও হইতে পারে। কিন্তু তারও আগে এই পথের ইতিহাস কোথাও পাইতেছি না। লৌহিত্য-ব্রহ্মপুত্রের উল্লেখ পুরাণে, প্রাচীন সাহিত্যে (যথা, মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে) এবং লিপিমালায় একেবারে অপ্রচুর নয়, এবং তাহা সুবিদিত। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন কামরূপরাজ্য ছিল এই লৌহিত্যের তীরে। গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত একবার লৌহিত্যতীরে কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মণের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন (ষষ্ঠ শতকের শেষাশেষি)। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এইসব প্রাচীন উল্লেখ সাধারণত লৌহিত্যের উত্তর-প্রবাহ সম্বন্ধে। দক্ষিণ-প্রবাহে যেখানে বারবার খাত


DESCRIPCAO
DO REINO
DEBENGALLA
REINO DE ORIXA
COSPETIR
PATANES
BENGAL
LA.
PIPILIPATAM
GOVRO

জাও ডি ব্যারোসের


REINO DE TIPORA
TIPORA
ESTADO DO
CODAVASCAM
REINO DE ARRACAM
ARRACAM
TRIPA
REINO SIROTE
REINO DE COMOTAII
CHATIGAM
COVAS
SORE
DOCAM
ENSEADA
DE
R.CAOR
Bondor
Sundiua

নকসা (১৬৫০ খ্রী)

পরিবর্তন হইয়াছে সে-সম্বন্ধে কোনও প্রাচীন ঐতিহাসিক উল্লেখ এখনও পাওয়া যাইতেছে না।

সুরমা-মেঘনা

মেঘনা সম্বন্ধে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। খাসিয়া-জৈন্তিয়া শৈলমালা হইতে মেঘনার উদ্ভব, কিন্তু উত্তর-প্রবাহে মেঘনা সুরমা নামেই খ্যাত এবং এই নামটি প্রাচীন। সুরমা শ্রীহট্ট জেলার ভিতর দিয়া মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমার পূর্বসীমা স্পর্শ করিয়া আজমিরিগঞ্জ বন্দর ও অদূরবর্তী বানিয়াচঙ্গ গ্রাম বাম তীরে রাখিয়া ভৈরব-বাজারে এক সময় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইত। নিম্নতর প্রবাহের কথা ব্রহ্মপুত্র-প্রসঙ্গেই বলিয়াছি। সুরমা যেখান হইতে পশ্চিমাগতি ছাড়িয়া দক্ষিণাগতি লইয়াছে (বর্তমান মার্কুলি স্টীমার স্টেশনের নিকট) সুরমা সেখান হইতে মেঘনা নামও লইয়াছে। রেনেলের নকশায় এই পথ সুস্পষ্ট দেখান আছে; আজমিরিগঞ্জ-বানিয়াচঙ্গও বাদ পড়ে নাই। এই নদীপথের উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হইয়াছে, ঐতিহাসিক প্রমাণ এমন কিছু নাই। মেঘনার নিম্ন-প্রবাহের দুই তীরে সমৃদ্ধ জনপদের পরিচয় চতুর্দশ শতকে ইব্‌ন্‌ বতুতার বিবরণেই পাওয়া যায়; পনর দিন ধরিয়া মেঘনার পথে তিনি গিয়াছিলেন; দুই ধারে ঘন বসতিময় গ্রাম, ফলের উদ্যান—মনে হইয়াছিল যেন কোনও বাজারের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। মেঘনা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি অনুমানের উল্লেখ এ-প্রসঙ্গে হয়তো অবান্তর হইবে না। চলিত লোকবচনে ও স্মৃতিতে এই উৎপত্তি মেঘনাদ বা মেঘানন্দ শব্দ হইতে। কিন্তু টলেমি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে গঙ্গার অন্যতম মুখের নাম করিয়াছেন Mega (=great) বলিয়া। এই Mega=Megna (Magna=great) নদী হইতে মেঘনাদ=মেঘানন্দ=মেঘনা নামের উৎপত্তি একেবারে ইতিহাস-বিরুদ্ধ না-ও হইতে পারে। তবে, ইহা একান্তই অনুমান।

করতোয়া

উত্তর-বঙ্গের নদনদীগুলির কথা এইবার বলা যাইতে পারে। উত্তর-বঙ্গের সর্ব-প্রধান নদী করতোয়া। এই নদীর ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং ইহার তীর্থ-মহিমা বহুখ্যাত; পুরাণে বারবার করতোয়া-মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, করতোয়া-মাহাত্ম্য নামে একখানা সুপ্রাচীন পুঁথি এখনও করতোয়ার তীর্থমহিমা ঘোষণা করে। লঘুভারতে বলা হইয়াছে, "বৃহৎপরিসরা পুণ্যা করতোয়া মহানদী"; মহাভারতের বনপর্বের তীর্থযাত্রা অধ্যায়েও করতোয়া পুণ্যতোয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং গঙ্গাসাগরসংগম তীর্থের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইয়াছে, পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী প্রাচীন পুন্দনগল (=পুণ্ড্রনগর= বর্তমান মহাস্থানগড় বগুড়ার অদূরে) এই করতোয়ার উপরই অবস্থিত ছিল। খুব প্রাচীন কালেও যে করতোয়া বর্তমান বগুড়া জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত তাহা মহাস্থানের অবস্থিতি এবং করতোয়া-মাহাত্ম্য হইতেই প্রমাণিত হয়। সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙ পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কামরূপ যাইবার পথে বৃহৎ একটি নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি এই নদীটির নাম করেন নাই; কিন্তু টাং-সু (Tang-shu) গ্রন্থের মতে এই নদীর নাম ক-লো-তু বা Ka-lo-tu। Watters সাহেব Ka-lo-tuকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। নিঃসন্দেহে ইহা ভুল। Ka-lo-tu স্পষ্টতই করতোয়া; এই নদীই যে সপ্তম শতকে পুণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপের মধ্যবর্তী সীমা, এ-খবরও টাং'-সু গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের কবি-প্রশস্তিতেও এই তথ্যের আংশিক সমর্থন পাওয়া যাইতেছে; সেখানে স্পষ্টতই বলা হইতেছে, বরেন্দ্রী দেশ (লিপিমালার বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী-মণ্ডল) গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী দেশ। যাহা হউক, এইসব উল্লেখ এবং লিপিমালার যে সব গ্রাম ও নগর বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বলা হইয়াছে (যেমন বায়ীগ্রাম=বৈগ্রাম, বর্তমান দিনাজপুর জেলায় হিলির নিকটে; কোলঞ্চ=ক্রোড়ঞ্জ, বোধ হয় দিনাজপুর

জেলায়; কান্তাপুর=কান্তনগর, বর্তমান দিনাজপুর জেলায়; নাটারি=নাটোর, বর্তমান রাজসাহী জেলায়; পদ্মবন্না=পাবনা ? ইত্যাদি) তাহাদের অবস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না যে, সপ্তম শতকে বরেন্দ্রীর পূর্বদিক ঘিরিয়া, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের পূর্ব-সীমা দিয়া করতোয়া প্রবাহিত হইত। করতোয়া-মাহাত্ম্য পাঠে মনে হয়, এক সময়ে করতোয়া স্ব-স্বতন্ত্র নদী হিসাবে গিয়া সাগরে পড়িত, কিন্তু তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। লোকস্মৃতি সাগর বলিতে বোধ হয় কোন বৃহৎ জলস্রোতকেই বুঝিয়া ও বুঝাইয়া থাকিবে। অন্তত, মধ্যযুগে করতোয়ার জল নিঃশেষিত হইতেছে প্রশস্ত পদ্মা-ধলেশ্বরী সংগমে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা পরে বলিতেছি।

তিস্তা : পূর্ণভবা : মহানন্দা : আত্রাই

করতোয়া ভোটান সীমান্তেরও উত্তরে হিমালয় হইতে উৎসারিত হইয়া দারজিলিং-জলপাইগুড়ি জেলার ভিতর দিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এই উত্তরতম প্রবাহে ইহার নাম করতোয়া নয়, দিস্তাং বা তিস্তা যাহার সংস্কৃতীকরণ হইয়াছে ত্রিস্রোতা। জলপাইগুড়ি হইতে তিস্তার (ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায় Tiesta) তিনটি স্রোত তিন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে; দক্ষিণ-বাহী পূর্বতম স্রোতের নাম করতোয়া, দক্ষিণবাহী মধ্যবর্তী স্রোতোধারার নাম আত্রাই; দক্ষিণ-বাহী পশ্চিমতম স্রোতের নাম পূর্ণভবা বা পুনর্ভবা। পুনর্ভবা উনবিংশ শতকে আইয়রগঞ্জের নিকটে মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হইত, এবং মহানন্দা রামপুর-বোয়ালিয়ার নিকটে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হইত। কিন্তু, তাহার আগে এক সময় মহানন্দা (এবং পুনর্ভবা) লক্ষ্মণাবতী-গৌড়ের ভিতর দিয়া আসিয়া করতোয়ায় নিজ প্রবাহের জল নিষ্কাশিত করিত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। রেনেলের নক্শায় সে-পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু ফান্ ডেন্ ব্রোকের আমলে মহানন্দার গতি আরও পশ্চিমে। আত্রাই (তঙ্গন-

আত্রাই) তিস্তা হইতে নির্গত হইয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া চলন বিলের ভিতর দিয়া জাফরগঞ্জের নিকটে করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হইত। ফান্ ডেন্ ব্রোক্, ইজাক্ টিরিয়ন্, থর্নটন, সকলের নক্শাতেই আত্রাই-করতোয়া সংগম সুস্পষ্ট দেখান আছে। এই নক্শাগুলিতেই দেখা যায়, আত্রাইর ছোট একটি শাখা পশ্চিমবাহী হইয়া পদ্মায় গিয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু তঙ্গন-আত্রাই পথই প্রধান প্রবাহপথ। দেখা যাইতেছে, তিস্তা হইতে নির্গত দুইটি স্রোতই উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়া প্লাবিত করিয়া তাহাদের জলরাশি শেষ পর্যন্ত ঢালিয়া দিত তৃতীয় স্রোতটিতে, অর্থাৎ করতোয়ায় ; তাহা ছাড়া, সে নিজের এবং উত্তরতম প্রবাহ তিস্তার সমস্ত জলধারা তো বহন করিতই। এইসব কারণেই ষোড়শ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত করতোয়া ছিল অত্যন্ত প্রশস্তা বেগবতী নদী। সপ্তদশ শতকের গোড়াতে মির্জা নাথনের বিবরণী (১৬০৮) পড়িলে মনে হয়, সাহাজাদপুরের (পাবনা) দক্ষিণে করতোয়া বক্র, সংকীর্ণ ও ক্ষীণতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ করতোয়া মৃতপ্রায় ; আত্রাই-পুনর্ভবারও একই দশা ! কিন্তু সপ্তদশ শতকেও অবস্থা তত খারাপ হয় নাই। ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায় (১৬৬০) আত্রাই ও করতোয়া দুয়েরই আকৃতি প্রশস্ত। টেভারনিয়ার ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে উত্তরাগত একটি বড় নদীর নাম করিতেছেন Chativor ; এই Chativor তো করতোয়া বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া, জাও ডি বারোস (১৫৫০) এবং কাস্তেল্লি দা ভিনোলা (১৬৮৩) এই দুইজনই তাঁহাদের নক্শায় উত্তর হইতে সোজা দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত লম্ববান একটি নদী দেখাইতেছেন ; ইহার নাম কাওর (Caor) কাওরকেও করতোয়া বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ইহাদের নক্শা যথাযথ নয় এবং সর্বত্র সর্বথা নির্ভরযোগ্যও নয় ; তবু সমসাময়িক বাংলার নদনদী-বিন্যাসের আভাস এই সব নক্শায় খানিকটা নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। হয়তো ইঁহাদের কাছে মনে হইয়াছিল, অথবা লোকস্মৃতিতে বা লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে, করতোয়া সাগরগামিনী নদী। Caor যে করতোয়া তাহার একটু পরোক্ষ

প্রমাণ ডি-বারোস নিজেই দিতেছেন। তাঁহার নক্শায় দেখিতেছি করতোয়া Reino de Comotah বা কামতা রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। কামতা বর্তমান রংপুর-কোচ্‌বিহার। করতোয়া-আত্রাইর সম্মিলিত প্রবাহ এক সময় হয়তো ব্রহ্মপুত্রে গিয়া মিশিত। এ-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই; তবে হাণ্টার সাহেব শুনিয়াছিলেন, করতোয়াতীরবাসীরা করতোয়াকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়াই জানিত। ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শায় করতোয়া ব্রহ্মপুত্রে গিয়া পড়িতেছে বলিয়া যেন মনে হয়। যাহাই হউক, বুঝা যাইতেছে সপ্তদশ শতকে করতোয়া (এবং আত্রাইও) উল্লেখযোগ্য নদী। অষ্টাদশ শতকে রেনেলের নক্শায়ও আত্রাই এবং করতোয়ার সেই মোটামুটি সমৃদ্ধ রূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এবং করতোয়া তদানীন্তন রংপুর-দিনাজপুরের ভিতর দিয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া, পুঁটিয়ার (Pootyah) কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে পদ্মার সঙ্গে প্রায় সমান্তরালে, পূর্ব-দক্ষিণ বাহিনী হইয়া পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের সংগমস্থানের নিকটে, পদ্মায় গিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের হিমালয়-সানুর বিরাট বন্যায় আত্রাই-করতোয়ার সমৃদ্ধি বিনষ্ট হইয়া গেল। উত্তর-প্রবাহে যে-তিস্তা এই নদী দুইটির সমৃদ্ধির মূলে, সেই তিস্তা এই বিরাট বন্যার বিপুল জলরাশি বহন করিতে না পারিয়া পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটি প্রায় অবলুপ্ত প্রাচীন সংকীর্ণ নদীর খাত ভাঙ্গিয়া সবেগে ফুলছড়ি ঘাটে ব্রহ্মপুত্রে গিয়া বিপুল জলরাশি ঢালিয়া দিল। সেই সময় হইতে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রমুখী, সে আর পুনর্ভবা-আত্রাই-করতোয়ায় হিমালয় নদীমালার জল প্রেরণ করে না। এবং, আজ যে এই নদী তিনটি, বিশেষভাবে করতোয়া, ক্ষীণা হইতে ক্ষীণতরা হইতেছে তাহার কারণও তাহাই। তবু, উনবিংশ শতকের গোড়ায়ও করতোয়ার কিছু খ্যাতি-সমৃদ্ধি ছিল বলিয়া মনে হয়; ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক য়ুরোপীয় লেখক বলিতেছেন, করতোয়া "was a very considerable river, of the greatest celebrity in Hindu fable"।

উত্তর-বঙ্গের আর একটি প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন নদী কৌশিকী (বা বর্তমান

কোশী)। এই কোশী উত্তর-বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ভিতর দিয়া সোজা দক্ষিণবাহিনী হইয়া গঙ্গায় প্রবাহিত হয়। অথচ, এই নদী এক সময় ছিল পূর্ববাহী এবং ব্রহ্মপুত্রগামী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সমস্ত উত্তর-বঙ্গ জুড়িয়া ধীরে ধীরে খাত পরিবর্তন করিতে করিতে কোশী পূর্ব হইতে একেবারে পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। কোশী প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার নদী-বিন্যাসের ইতিহাসে এক বিরাট বিস্ময়। কোশীর (এবং মহানন্দার) এইরূপ বিস্ময়কর খাতপরিবর্তনের ফলেই গৌড়-লক্ষ্মণাবতী-পাণ্ডুয়া অঞ্চল নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত হইয়া অস্বাস্থ্যকর এবং অনাবাসযোগ্য হইয়া উঠে, বন্যার প্রকোপে বিধ্বস্ত হয়, এবং অবশেষে পরিত্যক্ত হয়। কোচবিহার হইতে হুগলীর পথে রাল্‌ফ ফিচ্‌ (১৫৮৩-৯১) গৌড়ের ভিতর দিয়া আসিয়াছিলেন ; এই পথে "we found but few villages but almost all wildernes, and saw many buffes, swine, and deere, grasse longer than a man, and very many tigers"। সমস্ত উত্তর-বঙ্গ জুড়িয়া অসংখ্য মরা নদীর খাত, নিম্ন জলাভূমি এখনও দৃষ্টিগোচর হয় ; স্থানীয় লোকেরা ইহাদের বলে বুড়ী কোশী বা মরা কোশী। মালদহের উত্তরে ও পূর্বে যে-সব বিল ঝিল ইত্যাদি এখনও দেখা যায় সেগুলি এই কোশী ও মহানন্দার খাত হওয়া অসম্ভব নয়।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের আগে প্রাচীন বাংলার নদনদীগুলির যে-পরিচয় পাওয়া গেল তাহার মধ্যে দেখিতেছি গঙ্গা-ভাগীরথী, পদ্মাবতী, এবং লৌহিত্য-ব্রহ্মপুত্রই প্রধান। গঙ্গা-ভাগীরথীর ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত অজয়, দামোদর, সরস্বতী ও যমুনা প্রসিদ্ধা নদী। ইহাদের নাম প্রাচীন গ্রন্থ বা লিপি অথবা ঐতিহ্য-স্মৃতির মধ্যেও পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিম হইতে সমুদ্রবাহিনী কপিশা বা কাসাইও প্রাচীনা নদী। পদ্মা-প্রবাহও যে কম প্রাচীন নয় তাহাও দেখা গিয়াছে, এবং তাহারই শাখা কুমার নদীর নিঃসংশয় উল্লেখ টলেমির বিবরণীতেই পাওয়া যাইতেছে। করতোয়াও সুপ্রাচীন প্রবাহ ; কোশী-

মহানন্দা-আত্রাই-পুনর্ভবার খুব প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু ইহারাও সুপ্রাচীন বলিয়াই মনে হয়—অন্তত, কোশী-মহানন্দার প্রাচীন প্রবাহপথের ইঙ্গিত মিলিতেছে। ত্রিস্রোতা নামটিও প্রাচীন ঐতিহ্য-স্মৃতিবহ। লৌহিত্যের উল্লেখও খুব প্রাচীন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এইসব নদনদীর প্রবাহপথের কতকটা ইতিহাস এইখানে ধরিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। বাংলাদেশ ও বাঙালীর ইতিহাস আলোচনাকালে এই কথা সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মধ্যযুগে এইসব নদনদীর প্রবাহপথ বারবার যেমন পরিবর্তিত হইয়াছে, প্রাচীন কালেও সেইরূপই হইয়াছে, বিশেষত, পদ্মা ও গঙ্গার নিম্ন-প্রবাহে, নিম্ন-বঙ্গের সমস্ত তট জুড়িয়া, এমন কি উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গেও। বর্তমানেও এই ভাঙা-গড়া চলিতেছে।

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭, জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ